মৃত ও জীবিত

বিমল কর

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

আবীর দেখল, পরমা অফিস যাচ্ছে।

পরমা অফিস যাচ্ছে দেখার পর বেলা বুঝতে কষ্ট হয় না। আবীর সবে ঘুম থেকে উঠল, উঠে বড় বড় হাই তুলছে। হাই তুলতে তুলতে মাথার ওপর হাত তুলে, কাঁধের দু' পাশে ডানার মতন দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। ভেজা খামের চটচটে মুখের মতন এখনও ঘুমের আঠালো ভাবটা যেন তার চোখের পাতায় লেগে আছে; চোখের জমি লালচে, ছলছলে। সে বার দুয়েক কোমর ভেঙে সামনে ঝুঁকে আবার পিঠ পেছনে বেঁকাল, সোজা করল, তারপর শেষবারের মতন শব্দ করে হাই তুলল। দেখল, বটকেষ্টর দর্জির দোকান পেরিয়ে পরমা চলে যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পরমাকে বেশ দেখায়। মাথা সামান্য নিচু করে চোখ মাটিতে রেখে, মাঝারি ধরনে পা ফেলে সে হেঁটে যায়। এটাই তার স্বভাব। বেশির ভাগ সময় পরমা খোঁপাটোপা বাঁধে না; কখনও কখনও তার চুল এলো হয়ে থাকে, কখনও বা একটা সাদামাটা বিনুনি। শাড়ির আঁচলটা পিঠ দিয়ে জড়িয়ে ঘাড় আড়াল করে বুকের দিকে টেনে নেওয়ায় তার পিঠ, ঘাড় দেখা যায় না; চুলের মাপও বোঝা যায় না। পরমার গলার তলার দিকটাও দেখার উপায় নেই, আঁচলে ঢাকা। পোশাক-আশাকেও রঙের ঝোঁক পরমার নেই; সাদা কিংবা খুব হালকা মোলায়েম রঙ ছাড়া তার গায়ে কিছু দেখা গেল না আজও। এরকম পোশাকে কোনো মেয়ে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলে সহজে নজর পড়ার কথা নয়। অথচ ভগবানের কাছ থেকে পরমা চোখ, মুখ, নাক, গড়ন-টড়ন যা পেয়েছে তাতে সে রাস্তা দিয়ে চলে যাবার সময় আশেপাশে প্রবল গুঞ্জন তুলতে পারত। প্রথম প্রথম, পরমা যখন এখানে এল,

কিছু গুঞ্জন এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল; চায়ের দোকান থেকে চিত্ত-টিত্তরা একটু-আধটু গজলও গেয়েছিল; শেষ পর্যন্ত এ-সব উৎসাহ আর থাকল না। কারণ, পরমা উৎসাহ সৃষ্টির সুযোগই দিল না। তার সাদামাটা শাড়িজামা, চোখ নিচু করে হাঁটা, সংযত শিষ্ট ভাবসাবই শুধু নয়—তার অন্যান্য আচরণও যেন কেমন। দেখা গেল, পরমা যখন পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করে তখন সে কোনো কিছুই খেয়াল করে না। উদাসীনের মতন হেঁটে যায়, যেন এই শহর, গলি, রাস্তা, মানুষজনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে একা—নিঃসম্পর্ক। তার সাধারণ আগ্রহ বা কৌতূহলও যে আছে এমন মনে হয় না। নয়তো সেদিন পটুবাবুর কাপড়ের দোকানে যখন ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে হুলস্থুল হচ্ছে—তখন পরমা অফিস থেকে ফিরছিল; আবীররা ভেবেছিল এ-রকম একটা হট্টগোল দেখে পরমা রাস্তায় দু' দণ্ড দাঁড়াবে, কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে। পরমা অন্যমনস্ক ভাবে ভিড়, জটলা, পটুবাবুর দোকানের সামনে ছড়ানো-ছেটানো জিনিসপত্র দেখল, কিন্তু দাঁড়াল না, বা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। এই রকমই পরমা। অদ্ভুত। একটি মেয়ে, বা মহিলাই বলা যাক, আজ চার-পাঁচ মাস এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে নিত্য, অথচ পথের লোক কোনোদিন তার মুখে হাসি দেখল না, খুশির ছিটেফোঁটাও নয়। যখনই দেখো—নিস্পৃহ মুখ, বোজা ঠোঁট, উদাসীন দৃষ্টি। এ-সবের জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে—পরমার মুখে এক ধরনের বিষণ্ণতা বরং চোখে পড়ত, যা অনেকটা মুখের ময়লার মতন দেখাত। এমন শীতল, নিষ্প্রাণ, উদাসীন মেয়েকে নিয়ে করার কিছু ছিল না বলেই যুবকদল বোধ হয় চুপ করে গেল। তারপর আচমকা একদিন সুরপতি এসে খবর দিল, পরমা বিধবা। বছর খানেক হলো তার স্বামী মারা গেছে। মার্ডার কেস।···শুনে বিভূতি বলল, তাহলে তো ব্যাপারটা ধরা যাচ্ছে খানিক, মানে মুখের ওই দুঃখ-দুঃখ ভাবটার কথা বলছি। সবই মিস্টিরিয়াস ভাই।

আবীর জানলা দিয়ে আবার যখন তাকাল, দেখল: পরমা

রাস্তার ওপারে রিকশা-স্ট্যাণ্ডের কাছে চলে গেছে। এবার একটা রিকশা নেবে পরমা, নিয়ে অফিস চলে যাবে।

মুখটুখ ধোবার জন্যে আবীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

খানিকটা পরে ভেজা মুখ নিয়ে আবীর ফিরল। ফিরে চোখমুখ মুছতে মুছতে দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজের মুখ দেখল। মুখ দেখার সময় একবার নিজের জিভের রঙটা দেখে নিল। চুল আঁচড়াল অভ্যাস মতন, তারপর গায়ে জামা গলিয়ে নিয়ে দেওয়াল-তাকের ওপর রাখা মাটির এক ফুলদানির মধ্যে হাত ডোবাল। বোধ হয় হাত ডোবাবার পর আবীর তেমন খুশী হলো না। ফুলদানিটা উঠিয়ে নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘাঁটল, দেখল। খুচরো-টুচরো বাদ দিলে গোটা চারেক টাকা আছে। খুচরোগুলোই পকেটে পুরে নিল, নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোড়ের চায়ের দোকানে এত বেলায় কারও থাকার কথা নয়। আবীর কাউকে দেখল না; বিভূতি, ভূষণ, সুরপতি—কেউ নেই। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট নিয়ে আবীর সকালের চা খেতে লাগল। বেশ বেলা হয়ে গেছে, অফিস কাছারির লোকজন আর বড় দেখা যাচ্ছে না, হন্তদন্ত হয়ে এক-আধজন ছুটছে অবশ্য, তা এরা বরাবরই এই রকম ছোটে। পশুপতি উকিলকে আবীর দেখতে পেল; সেই ঝড়ঝড়ে গাড়ি, পেছনের সীটে পশুপতি গদিতে হেলান দিয়ে বসে, একপাশে তার ক্রাচ দুটো হেলান দিয়ে রাখা, পশুপতির গায়ে কালো জোব্বা, হাতে চুরুট। এক-পা খোঁড়া পশুপতি এখন এ-শহরের পয়লা নম্বর উকিল, সকাল সন্ধ্যে তার পায়ে পায়ে লক্ষ্মী ঘুরছে, মক্কেল-লক্ষ্মী। পশুপতি এবার গাড়ি দাঁড় করাবে কালীমন্দিরের কাছে, দাঁড় করিয়ে গাড়িতে বসেই কালীদর্শন করবে, প্রণাম সারবে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে; তারপর কাছারিতে চলে যাবে। কালীদর্শন বাবদ পশুপতি নাকি মাসে বিশ টাকা পুরুতকে পুজোর জন্যে দেয়। এই পশুপতির পুরোনো বাড়িতে পরমা ভাড়াটে হয়েছে।

কেউ কেউ বলছে, পরমা পশুপতির একরকম আত্মীয়, সম্পর্কে ভাগ্নে-বউ বা ভাইপোর বউ।

আবীর চা খেতে খেতে রাস্তা দেখছিল। ঝকমকে রোদ রয়েছে রাস্তায়, ধুলোর ভাবটা বাড়ছে আজকাল, শীত আসছে; শীত আসছে বলে ওদিকের শিমুল গাছটা আকাশ দেখছে যেন। পশুপতির গাড়ি চলে গেছে। একটা লম্বা সাইজের ছোঁড়া হাফ-প্যাডেলে সাইকেল চড়ে যেতে যেতে প্রায় নালায় গিয়ে পড়েছিল। আর একটু হলেই হারামজাদা কাদায় পাঁকে ডুবত।

একটা সিগারেট পকেট থেকে তুলে নিয়ে আবীর সবে ধরিয়েছে, ত্রিদিব এসে ঢুকল।

আবীর অবাক হলো। "কী রে স্কুলে যাস নি?"

ত্রিদিব বসতে বসতে বলল, "না। ছুটি।"

"ছুটি! আজ কিসের ছুটি?"

"ছুটি নিয়েছি। বাবার বার্ষিক কাজকর্ম হচ্ছিল, তাই ছুটি নিলাম।" বলে ত্রিদিব দোকানের ভেতরে তাকাল, চা দিতে বলল। আবীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে এবার বলল, "বার্ষিক-ফার্ষিক আর চলে না। চার-পাঁচ বছর হয়ে গেল। এখনও বার্ষিক। মা'র জন্যে না বলতে পারি না; করতে হবে না বললে ভাববে, মরা বাপের ওপর ছেলের ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। বড় উইক্ পয়েন্ট, বুঝলি···।"

ত্রিদিব এখানকার স্কুলে ড্রইং মাস্টার। ছেলেদের আম, কলা, লেবু, আমপাতা, বটপাতা আঁকতে শেখায়; সেই সঙ্গে নিচু ক্লাসে স্বাস্থ্য পড়ায়।

সিগারেট খেতে খেতে আবীর হেসে বলল, "জ্যান্ত বাপের ওপর তোর কত না ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল!"

ত্রিদিবও হেসে ফেলল। বলল, "যাঃ, ওটা বলিস না। বাবার সঙ্গে আমার লড়ালড়ি একবারই হয়েছিল, আর্ট স্কুলে পড়তে যাবার সময়; নয়তো আমি বরাবরই বাড়ির সুবোধ বালক।"

আরও দু'-চারটে হাসিঠাট্টার কথা হলো দু' বন্ধুতে, ততক্ষণে

ত্রিদিব চা পেয়ে গেছে। চা খাচ্ছিল।

সামান্য চুপ করে থেকে আবীর কিছু ভাবল, ত্রিদিবকে কখনও লক্ষ করল, কখনও বা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "কাল একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। সাংঘাতিক—।"

ত্রিদিব চোখ তুলে তাকাল, আবীরকে দেখল। আবীর মাঝে মাঝেই কাণ্ড করে; এ সব কাণ্ডের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই; কখনও শঙ্কুদের তাসের আড্ডায় গিয়ে দশ-পনেরো টাকা কামিয়ে নেয়, বেখেয়ালে মদ খেয়ে যাচ্ছেতাই মাতলামি করে; কখনও বা স্টেশনে গিয়ে বিদ্যুৎদার ট্যাক্সি কেড়ে নিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করে, বিদ্যুৎদা অবশ্য ভরসা করে ওর হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয় না—পাশে বসে থাকে নিজে; কোনোদিন দেখো—আবীর অকারণে বা সামান্য কারণে রাস্তার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছে; আবার এক-আধ সময় শালা বৈরাগী হয়ে শ্মশানে গিয়ে বসে বিড়ি টানে। ছোট-বড় আরও অনেক কাণ্ড প্রায়ই আবীর করে থাকে। বন্ধুরা এসব জানে, জানে বলেই তেমন আর অবাক হয় না। ইদানীং কিন্তু আবীরের অনেক কাণ্ড বন্ধ হয়ে এসে শান্তটান্তই হয়ে পড়ছিল। নিজেই মাঝে মাঝে বলে: বেশ ভদ্রলোক হয়ে যাচ্ছি শালা, গায়ে চর্বি জমে যাচ্ছে···।

চা খেতে খেতে ত্রিদিব বলল, "কিসের কাণ্ড?"

আবীর সিগারেটের আগুন খেলাচ্ছলে যেন নিজের নোখে ছোঁয়াতে লাগল। বলল, "কাল পরমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।"

আর একটু হলেই যেন ত্রিদিব বিষম খেত। মুখে চা ছিল। বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই যেন হচ্ছে না—একেবারে বোকা, হতভম্বের মতন মুখ করে ত্রিদিব কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, "যাঃ!"

আবীর হাসির মুখ করল। তার হাসি দেখে মনে হচ্ছিল, আরও কিছু রহস্য রয়েছে।

"ব্লাইণ্ড্ খেলছিস?" ত্রিদিবের অবিশ্বাস যাচ্ছে না।

"না রে, সত্যি। মাইরি।"

"কী করে?"

"সেটাই অবাক কাণ্ড। আমি শালা নিজেও বুঝতে পারছি না। হয়ে গেল।"

ত্রিদিবের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। বলল, "পরে কাপড় কোঁচাবি, আগে ব্যাপারটা বল।"

আবীর ঘটনাটা বলল। বলল, কাল সন্ধ্যেবেলায় সে শঙ্কুর কাছে গিয়েছিল। শঙ্কুর বউয়ের অসুখ; তাস-টাস আর খেলছে না শঙ্কু। সেখানে খানিক গল্পটল্প করে আবার চলে গেল স্টেশন। বিদ্যুৎদার সঙ্গে দেখা, সর্দি-জ্বর হয়েছে, বলল: খানিকটা থেকে যা আবীর, কলকাতার মেল আসছে, একটা প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে যাব, তারপর সোজা বাড়ি। আবীর থেকে গেল। প্যাসেঞ্জার যেটা পাওয়া গেল সে-বেটা কোলিয়ারির ম্যানেজার, যাবে ঘুসকি, মানে তোর পাক্কা এগারো মাইল, যেতে এগারো আসতে এগারো। বিদ্যুৎদা নিচ্ছিল না, আবীর নিয়ে নিল। রাস্তায় বিদ্যুৎদা বলল, আমায় তুই বাজারে নামিয়ে প্যাসেঞ্জার পৌঁছে দিয়ে আয়, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার। সাবধানে যাবি-আসবি।

"বিদ্যুৎদাকে নামিয়ে দিলাম বাজারে—" আবীর বলল, "নামিয়ে ম্যানেজারসাহেবকে নিয়ে চললাম ঘুসকি। ফেরার পথে মাইরি কোলিয়ারির রাস্তা ছাড়িয়েছি কি দেখি পরমা। একেবারে তোর বড় রাস্তার গায়ে ওয়েলফেয়ার অফিস আর কোয়ার্টারগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে, পাশে এক বুড়ো টাইপের লোক। কী যে হলো, একেবারে পাশে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিলাম।"

ত্রিদিব যেন রীতিমত শিউরে উঠেছে, সারা গা নড়িয়ে সেরকম এক ভঙ্গি করল, করে টেবিলের ওপর এক ঘুঁষি মারল। "সাব্বাস! এ শালা একেবারে বাংলা ফিল্ম। তারপর?"

আবীর সিগারেটের টুকরো ফেলে দিল। বলল, "আমি ভেবেছিলাম, পরমা আসবে না। এলেও বুড়োটা সঙ্গে থাকবে!"

"তুই আসতে বললি? ডাকলি?"

"কী জানি! আমি আসতে বললাম, না ভাড়া নিয়ে যাবার মতন করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, না উল্লুকের মতন একটা শব্দ করলাম —কী যে করলাম কে জানে!···অবাক মাইরি, পরমা গাড়ির দরজার কাছে এসে গেল। আমি ভড়কে গিয়ে গাড়ির দরজাটাও খুলতে পারলাম না। তারপর শুনলাম, বুড়োর সঙ্গে পরমা কথা বলছে। কী বলছিল বল তো?"

ত্রিদিব বলল, "বুড়োকে ডাকছিল?"

"না না—" আবীর মাথা নাড়ল, "বুড়ো বলছিল—বাসে যাওয়াই ভাল বাস আসবে। পরমা বলল, রাত হয়ে গেছে—সে এই ট্যাক্সিতেই ফিরবে, আমাকে সে চেনে, পাড়ার লোক।" আবীর থামল, ত্রিদিব কতটা অবাক হয়েছে—কথাটা বিশ্বাস করল কিনা তা যেন লক্ষ করল, তারপর বলল, "গাড়ির দরজা খুলে দিলাম, পরমা পিছনে এসে বসল। একা। অ্যালোন।"

ত্রিদিব পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে আবীরের দিকে ছুঁড়ে দিল। "সাব্বাস···, চালিয়ে যা, ইন্টারভ্যাল দিস না, শালা!"

আবীর সিগারেটের প্যাকেট থেকে নিজে একটা নিল, ত্রিদিবকে দিল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে বলল, "তারপর অনেক কিছু হয়ে গেল।"

অনেক কিছু বলতে আবীর যে ধারাবাহিক বিবরণ দিল তাতে বোঝা গেল, পরমা আবীরকে চিনতে পেরেছিল বলে পথে কিছু কথাবার্তাও বলছিল, তেমন একটা গল্প যদিও নয়, তবু গল্প করছিল; রাস্তায় একবার গাড়ির গোলমালও হলো, মিনিট দশ-পনেরো ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো; কপাল ভাল, গাড়িটা আবার চলল, নয়তো ঝামেলা হতো। তারপর পরমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল যখন আবীর—তখন প্রায় দশটা বাজে। পরমাকে পৌঁছে দিয়ে বিদ্যুতের বাড়িতে গাড়ি রেখে তবে বাড়ি ফিরল সে।

আবীর বলল, "টাকা—মানে ট্যাক্সির ভাড়া দিচ্ছিল পরমা। নিই নি। আমি যত বলি গাড়ি আমার নয়—আমাদের এক বন্ধুর

—বিনুদার—আমি তার হয়ে খেটে দিচ্ছি একটু, ফাঁকা ফিরছিলাম বলে পরমাকে তুলে নিয়ে এসেছি, ততই পরমা মাথা নাড়ে—তা কী করে হয়, এ বড় অন্যায়। টাকাটা আপনি নিয়ে যান, আপনার বন্ধুকেই দিয়ে দেবেন।"

"তুই টাকা নিলি?"

"দূর, আমি টাকা নেব কেন! শেষে স্ট্রেট বললাম, দেখুন মশাই—গাড়ি আমার নয়, আমি ড্রাইভার নই। পরের গাড়ি, আমি শুধু একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। গাড়ি এমনিই ফিরত, ফাঁকা, আপনাকে পেয়ে তুলে নিয়েছি। ব্যস্, আর ঝামেলা করবেন না।" আবীর এমনভাবে বলল যেন পরমার সামনেই সে কথা বলছে।

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলল, "পরমাকে তুই মশাই বললি?"

"তো কী বলব! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।" আবীরও হাসল।

ত্রিদিব সিগারেট টানতে টানতে আবীরের মুখ দেখছিল। হঠাৎ বলল, "রাস্তায় সত্যি সত্যি গাড়ি বিগড়েছিল, না তুই শয়তানি করে বন্ধ করে রেখেছিলি?"

"না—" আবীর মাথা নাড়ল, "ওরকম শয়তানি আমি করি না।"

"সাধু শালা।"

"অল্‌ওয়েজ।"

ত্রিদিব আবার হেসে উঠে টেবিলে সামান্য তবলার বোল বাজিয়ে নিল। বলল, "তা যাক্, কেমন দেখলি পরমাকে?"

"তোরা যেমন দেখিস।"

"আমরা আর দেখি কোথায়! সেরেফ রাস্তার ওপর মাস্তুল দেখি। আসল জাহাজ আর চোখে পড়ে কই রে! তুই তবু খানিকটা দেখলি। লাকী…"

আবীর একটু চুপ করে থেকে এবার বলল, "ভালই দেখলাম। কথায়বার্তায় বেশ ভদ্র। তবে অবলাটবলা নয়; ভেতরে স্ট্রেংথ আছে। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলে মনে হলো।"

"মেয়েদের বুদ্ধি কোনো ব্যাপার নয়," ত্রিদিব হাত নেড়ে বলল, তারপর এক চোখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করল, "শুদ্ধি কেমন আছে বল ?"

আবীর ইঙ্গিতটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। তবু বলল, "কী—?"

"শুদ্ধি! বিধবার শুদ্ধি কিনা…"

বন্ধুকে দেখতে দেখতে আবীর এবার বলল, "তোর খুব রস হয়েছে। বাপের বার্ষিক করে রস বাড়ছে নাকি রে শালা!"

ত্রিদিব হেসে ফেলল। এবার বলল, "ওর পাস্ট্ প্রেজেণ্ট কিছু ধরতে পারলি? সত্যিই বিধবা? স্বামী খুন হয়েছে?"

মাথা নাড়তে নাড়তে আবীর বলল, "জানি না।…তুই একেবারে উল্লুক। আমায় ও-সব কথা বলবে কেন!"

ত্রিদিব আর কিছু বলল না।

আরও খানিকটা বসে থেকে দু'জনে উঠে পড়ল।

রাস্তায় নেমে আবীরের ইচ্ছে হলো, ত্রিদিবকে বলে যে আজ সন্ধ্যেবেলায় তার পরমার বাড়ি যাবার কথা আছে। পরমা ডেকেছে। গতকালকের ব্যাপারের পর আজ আবীরকে ডাকা খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নাও হতে পারে। তবু কোথাও একটু অবাক হবার ব্যাপার আছে বইকি। পরমা ঠিক অতটা সামাজিক, আলাপী, উৎসাহী বা মিশুকে মেয়ে নয়; কিংবা তার পক্ষে আবীরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকারও তেমন কোনো কারণ নেই। তবু আবীর ঠিক বুঝতে পারছে না, পরমা কেন তাকে আজ সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি যেতে বলেছে। ভদ্রতা হয়তো। খেয়ালও হতে পারে। মানুষের খেয়ালের কথা বলা যায় না। বিশেষ করে সেইসব মানুষদের যাদের স্বভাব-টভাব খানিকটা রহস্যময়। কে জানে পরমা কেন যেতে বলেছে! আবীর কিছু বলল না ত্রিদিবকে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিবুর সেলুনটা চোখে পড়তেই আবীর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "তুই যা ত্রিদিব, আমি দাড়িটা কামিয়ে নিই।" বলে সেলুনে ঢুকে পড়ল।

২

বাড়ি ফিরে আবীর দেখল, মা ফিরে এসেছে। কাপড়জামা ছেড়ে এখন কিছু সংসারের কাজ করছে; মাথার চুল খোলা, গায়ে জামা নেই, আঁচলটা গায়ে জড়ানো। তেলের শিশি, কাপড় কাচা সাবানের টুকরো, দাঁতের মাজন বারান্দার এক কোণে নামানো। মা স্নান করতে যাবে এবার।

রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এল আবার, কলাইকরা একটা গামলা হাতে। সোডা-সাবানের জলে গামছা-টামছা ডোবানো। কলঘরে গামলাটা রেখে দিয়ে এসে মা এবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাথার চুল এলোমেলো করে ঘেঁটে নিল। তারপর তেল দিতে বসল।

আবীর ততক্ষণে গায়ের জামা ছেড়ে এসেছে। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে মাকে দেখছিল। এখনও তার মা দেখার মতন। লম্বা চেহারা, সচরাচর মাথায় এতটা লম্বা মেয়েরা হয় না। মা বেশ লম্বা, গায়ে ছিপছিপে, শরীর এখনও অপটু হয়নি। পঞ্চাশের গায়ে দাঁড়িয়েও মা'র মাথার একটা চুলও সাদা হয়নি, চর্বি জমেনি, বা চামড়া কোথাও কুঁচকে যায়নি। মা'র মাথায় অবশ্য খুব চুল নেই, ঘাড় পর্যন্ত, কোঁকড়ানো চুল। মুখখানি, শরীরের মতনই, লম্বা ধাঁচের; শক্ত দীর্ঘ নাক, বড় বড় টানা চোখ, থুতনির ডৌলটি চমৎকার, মস্ত একটা তিল রয়েছে থুতনিতে। গায়ের রঙটি শ্যাম।

আবীর মাকে দেখতে দেখতে একটু ভাবল। মা'র ঠিক এতটা গম্ভীর চুপচাপ থাকার কথা নয়। এখন পর্যন্ত আবীরের সঙ্গে একটাও কথা বলল না। কোনো কোনো দিন রাত্রে শঙ্কুটঙ্কুর

পাল্লায় পড়ে বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে বমিটমি করে একশা করলে পরের দিন মা এই রকম থাকে—গম্ভীর, থমথমে। কাল রাত্রে আবীর মদফদ খায়নি। বিদ্যুৎদার বাড়িতে গাড়ি রেখে, বউদির হাতে ভাড়ার টাকা দিয়ে সে সোজা বাড়ি ফিরে এসেছে পরমার কথা ভাবতে ভাবতে। যখন ফিরেছে মা তখনও জেগে। তবু আজ মা'র মুখের অবস্থা ওরকম কেন ? আবীর বুঝতে পারল না।

মা'র সঙ্গে ভাব পাতাবার বা মা'র মন নরম করার কতক কৌশল আছে আবীরের। বরাবরই সে এরই কোনো না কোনোটা সুবিধে মতন বেছে নেয়। মাকে দেখতে দেখতে আবীর ভাবল একটু, তারপর হালকা গলায়, যেন মা'র সঙ্গে ঠাট্টা করছে, বলল, "ডাক্তার দিদিমণির কী হলো ?"

কোনো জবাব নেই। মা মাথার চুলে তেল ঘষছে।

সামান্য অপেক্ষা করে আবীর আবার বলল, "আমাদের লেডী ডাক্তার বিজনবালার কে মরেছে ?"

বিজনবালা একবারের জন্যেও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন না।

আবীর দু' পা এগিয়ে গিয়ে এবার গম্ভীর গলা করে ডাকল, "বিজন—?"

বিজনবালা এবার যেন বাধ্য হয়েই ঘাড় ঘোরালেন।

আবীর হেসে বলল, "তুমি যদি আমার দিকে এক্ষুনি অ্যাবাউটটার্ন হয়ে না দাঁড়াও তবে আমি বিজু বিজু বলে চেল্লাব।"

বিজনবালা আরও একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "থাক, অসভ্যতা জাহির করে আর তোমাকে লেজ গজাতে হবে না। অনেক লেজই তো গজিয়েছ।"

আবীর মস্ত মুখ করে হাসতে লাগল। "লাখ লাখ লোক মা কালী, মা তারা, মা দুর্গা বলে ডাকে, আর আমি আমার মাকে মা বিজন, বিজু বলেই অসভ্যতা ! যা বাব্বা !"

বিজনবালা বললেন, "আমি মা দুর্গা নই।"

"আলবাত তুমি দুর্গা। দুর্গার বেশী। মাই মাদার। জননী

জন্মভূমিশ্চ……ও মাই মাদার মেরী……” বলতে বলতে আবীর পেছন থেকে দু’হাত দিয়ে বিজনবালার কোমর জাপটে ধরে তুলে নিল একটু। একপাক ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ ঝাঁকিয়ে মা’র ঘাড়ে চুলে মুখ ঘষে ছেলেমানুষের মতন সোহাগ করতে লাগল। তারপর টপ করে মা’র গালে চুমু খেয়ে ফেলল।

অতিষ্ঠ হয়ে বিজনবালা ছেলের গালে ঠাস করে এক চড় মারলেন আদরের। “ছাড় আমায়……অসভ্য, বাঁদর……”

আবীর মাকে ছেড়ে দিল। হাসতে হাসতে বলল, “তোমায় একদিন আমি কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে দৌড় মারব।”

“তা তো মারবিই ; আমায় কাঁধে চাপাবার জন্যেই বসে আছিস তুই। সবুর সইছে না।”

আবীর এবার রাগ করার মুখ করল। “তোমার মা যত রদ্দি কথাবার্তা।……দাও তো, আমার মাথায় একটু তেল ঘষে দাও।”

বিজনবালা ছেলের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে লাগলেন।

আবীর শুধলো, “কী হয়েছে, মা ?”

“কিছু না।”

“না ? তুমি তাহলে এত গম্ভীর কেন ?”

“এমনি।”

“হতেই পারে না, বাজে কথা।”

বিজনবালা প্রথমে জবাব দিলেন না, পরে শাড়ির আঁচলের কোনা আঙুলে জড়িয়ে আবীরের কানের ময়লা পরিষ্কার করে দিতে দিতে বললেন, “যোগেনবাবুর মেয়ের বাচ্চাটা বোধ হয় আর বাঁচবে না।”

“কোন যোগেনবাবু ? নার্সারীর ?”

বিজনবালা মাথা নাড়লেন আস্তে করে, বললেন, “এই নিয়ে তিনটে বাচ্চা হলো, তিনটেই মরল। কপাল বেচারী মেয়েটার।”

আবীর কিছু বলল না। মা’র এই স্বভাব বরাবরের। মা’র

হাতে কারও মরা বাঁচা নির্ভর করে কি না আবীর জানে না, কিন্তু দেখেছে মা'র চোখের সামনে কেউ মরছে দেখলে মা কাতর হয়ে পড়ে। যোগেনবাবুর মেয়ে হয়তো মা'র রোগী ছিল, বাচ্চাটা ছিল কিনা কে জানে, থাকতে পারে।

বিজনবালা স্নান করতে চলে গেলেন। আবীর বারান্দায় রোদে-ছায়ায় বসে থাকল। সদর ঠেলে মকরদি একবার ভেতরে এসে আবার চলে গেল। কাছাকাছি তার বাড়ি, এ-সংসারে সাতসকালে সে এসে ঢোকে, রান্নাবান্না, ঘরদোর মোছামুছির কাজ সেরে বেলায় চলে যায়, দুপুরে উঁকি দিয়ে যায় এক-আধবার, আবার বিকেলে আসে—কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যের পর চলে যায়। বলতে কি, যতক্ষণ মা বাড়িতে থাকল ততক্ষণ মা দেখছে, নয়তো মকরদির হাতেই এ-বাড়ির দেখাশোনার ভার। মকরদি এ বাড়িতে এসে থাকতে পারত, পারে না তার মেয়ের জন্যে, নাতির জন্যে। মেয়েটা কাজ করে, নাতিটা স্কুলে পড়ে। মকরদি নিজেই বলে, তার দু' সংসার—একটা মা'র অন্যটা মেয়ের, দুইই সে সামলে যাচ্ছে।

কলঘরে বিজনবালা স্নান করতে শুরু করেছিলেন; জল ঢালার শব্দ আসছে। আবীর এতটা তফাতে বসেও যেন অনুভব করতে পারল মা'র ভেজা মাথার চুলের গন্ধে কলঘর ভরে উঠেছে।

এই তার মা—শ্রীমতী বিজনবালা সেন, ডক্টর মিসেস বিজনবালা সেন। শহরের লোকের কাছে লেডী ডাক্তার। আবীরের কাছে —তার মা, বিজু মা, বিজন, মেরী মাতা।

মা'র কথা আবীর সব জানে না, বাবাকেও আবীরের তেমন মনে পড়ে না। আবীরের বছর পাঁচ-ছয় বয়সে তার বাবা মারা গেছে। বাবার ছবি, মা'র কাছে শোনা বাবার গল্প এবং নিজের অতি অস্পষ্ট বাল্যস্মৃতি থেকে তার বাবা সম্পর্কে যেটুকু ধারণা রয়েছে তাতে আবীর তার বাবাকে অন্য পাঁচজনের বাবার চেয়ে আলাদা করে ভাবতে পারে না। ফটোতে যে-মুখ বাবার তাতে সাধারণ ভদ্রলোকের মতনই দেখায়, খানিকটা চতুর ধরনের, মাঝ-মধ্যে

একটু সিঁথি—অ্যালবার্ট করা চুল। চোখের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, ফটো তোলাবার সময় আড়ষ্টতা ছাড়া। সেটা ফটো তোলানোর দোষও হতে পারে। সরু চোয়াল, পাতলা নাক, মাঝারি কপাল —দেখেশুনে প্রখর বুদ্ধিমান বা বোকা কোনোটাই মনে হয় না, মনে হয় সবাই যেভাবে সংসারে চলে, বাবা সেইভাবেই চলতে অভ্যস্ত ছিল। তবে হ্যাঁ, একটু শৌখিন ধাতের লোক মনে হতে পারে বাবাকে, সে পোশাক-আশাক পরার ধরন থেকে। মা অবশ্য বলে, বাবা খুবই শৌখিন লোক ছিল। ভাল ধুতি-জামা ছাড়া পরত না, গায়ের গেঞ্জি কিনত বেছে বেছে, পাতলা মোলায়েম গেঞ্জি, রোজ জুতো পালিশ করে পরত, নরম সিগারেট খেত। আর বাবার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল কথা বলা, এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারত যে, সেই কথায় বশ হবে না এমন লোক ছিল না। বাবার গলার স্বর ভরাট ছিল, তার চেয়েও সুন্দর ছিল কথা বলার ধরন। আবীর তেমন কিছু মনে করতে পারে না, তবে মনে হয়, বাবার এ গুণ থাকলেও থাকতে পারে। কেন না, বাবা মাকে ভুলিয়ে রেখেছিল, নয়তো মা'র তুলনায় বাবা কিছু না হয়েও সংসারে শান্তি বজায় রাখল কী করে! আর এখনও বা মা কী করে বাবার কথা উঠলে ওই কথাটাই জোর দিয়ে দিয়ে বলে: 'তোর বাবার মতন কথায় মানুষ ভোলাতে আমি আর দেখিনি। একদিনের জন্যেও মানুষটা আমায় মাথা গরম করতে দিল না।'

মা নিজের বিষয়ে অনেক কিছুই বলে না। বোধ হয় সেসব আবীরকে বলা যায় না বলেই বলে না। কিন্তু আবীর মা'র জীবনের যেটুকু জানে তাতে মনে হয় বাবা মা'র উপযুক্ত ছিল না। মা উঁচু ঘরের মেয়ে ছিল, শিক্ষাদীক্ষাও ছিল। মা মেডিকেল স্কুলে পড়তে ঢুকেছিল। মা'র বাবা মারা যাবার পর অপদার্থ দুই ভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, এবং আরও দশটা পারিবারিক অশান্তির জন্যে মা যুদ্ধের সময় বাড়ি ছেড়ে, পড়া ছেড়ে নার্সিংয়ে ঢুকে যায়। মিলিটারিতে তখন ওই সুবিধে খুব। ঢুকে পড়ে মা

চটপট ট্রেনিংটা শেষ করে ফেলে। তারপর কাজ করতে করতে আবার একটা ট্রেনিং। সেটাও শেষ হয়ে গেলে মা মিলিটারির কিরকম এক শর্ট কোর্সে লেখাপড়া করে দিব্যি নিজের পা রাখার মাটি করে নিল। তারপরই মা নাকি ডাক্তার, অন্তত লোকের মুখে মুখে ডাক্তার। মা'র কাছে, বাক্স-তোরঙ্গের মধ্যে অনেক কাগজ-পত্র আছে: হাসপাতালের, মিলিটারির, নার্সিংয়ের, পরীক্ষা-টরীক্ষার। এরই দৌলতে মা যুদ্ধটুদ্ধ থেমে যাবার পর চাকরি পেয়েছিল। তখন ছিল অন্য জায়গায়। সেখান থেকে এখানে চলে এল। মা এখানে এসে চাকরি নেবার পর আবীর জন্মেছে। এখানকার লোহা কারখানা তখনই বেশ বড়, তবু আজকের মতন বড় ছিল না। মা প্রথমে বড় হাসপাতালে ছিল। তারপর এক এক করে, কারখানা যত বাড়তে লাগল, স্টাফ কোয়ার্টারস ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ততই সুবিধের জন্যে এক এক এলাকায় ছোট হাসপাতাল গড়ে উঠতে লাগল। মাকে ধীরে ধীরে বড় থেকে ছোট, ছোট থেকে আরও ছোট হাসপাতালে পাঠাতে লাগল। ডিগ্রী-অলা বড় বড় ডাক্তার, হালফিল পাশ করা ছোকরা ডাক্তার-টাক্তার এসে বেচারী বিজনবালাকে ধাক্কা মারতে মারতে নীচে নামিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত মা চাকরি ছেড়ে দিল। দিয়ে কারখানার বাইরে, হাট এবং নার্শারীর কাছে মা নিজের পেশা নিয়ে বসল। সেই থেকে মা আরও বেশী করে লেডী ডাক্তার বলে পরিচিত হয়ে গেল। এখন মা'র পশার বেশ পড়ে আসছে। চারদিকে এত ডাক্তার-টাক্তার, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন হয়ে যাওয়ায় মাকে আর তেমন করে কেউ দাম দেয় না। সাধারণ গেরস্থ বাড়ি আর গরীব-টরীবদের মধ্যেই মা'র যেটুকু প্রতিষ্ঠা। আর পুরোনো কেউ কেউ, যারা মা'র ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে। আজও এরা বউ-ঝিয়ের বাচ্চাকাচ্চা হবার সময় মাকে ডাকাডাকি করে। কাচ্চাবাচ্চার ঘরোয়া অসুখেও বিজনবালার পরামর্শ নেয়। যা দেখা যাচ্ছে, এরপর মা'র হাত থেকে এসবও একদিন চলে যাবে।

আবীর কখনও কখনও মা এবং বাবার কথা ভাবতে গিয়ে দেখেছে, মা'র স্বভাব এবং চরিত্রের সঙ্গে বাবার কোনো মিল ছিল না। যে সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে মা নিজেকে দাঁড় করিয়েছে তাতে মা'র ক্ষমতা, জেদ, কর্মশক্তি, উদ্যম এবং আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বাবার এসব কিছু ছিল না। স্ত্রীর অর্থে অলস জীবনযাপন এবং শৌখিনী করা ছাড়া বাবার আর তেমন কী উদ্দেশ্য ছিল বেঁচে থাকার! ফলে ভদ্রলোককে চতুর হতে হয়েছিল। গুছিয়ে গুছিয়ে সুন্দর কথা বলা ছাড়া নিজেকে বাঁচাবার পথ ছিল না বলেই ওই একটা ব্যাপার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছে। হ্যাঁ, আবীর অস্বীকার করছে না, বাবার কথা বলার, লোক ভোলাবার অসামান্য গুণ ছিল। না থাকলে মাকে ভোলাতে পারবে কেন?

মা যদিও কোনোদিন বলেনি, কিন্তু আবীরের সন্দেহ, মা নিশ্চয় বাবার কথায় ভুলে বাবাকে পছন্দ করেছিল, ভালবেসে-ছিল, বিয়ে করেছিল। আর বরাবর মা সেই ভুলেই ভুলে থেকেছে। বাবার ওপর আবীরের রাগ, বিদ্বেষ, আক্রোশ— কিছুই নেই, কেন না, যে লোক অনেক আগেই পালিয়ে গেছে—যার সঙ্গে আবীরের কোনো সম্পর্কই হলো না, তার ওপর রাগটাগ করা যায় না। আবীরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শুধু মা'র।

বিজনবালা কলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে কাচা কাপড়, গামছা, টুকিটাকি আরও কিছু; মাথার কোঁকড়ানো চুল ভেজা ভেজা, গালের পাশ দিয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে। গলায় সরু একটি হার।

আবীর কয়েক পলক মা'র দিকে তাকিয়ে থাকল।

উঠোনে টাঙানো তারে ভেজা কাপড়-গামছা রেখে দিতে দিতে বিজনবালা বললেন, "নে ওঠ, আর বসে থাকিস না।"

আবীর উঠে পড়ল। বলল, "তোমার গামছাটা দাও।"

"কেন, তোরটা?"

"ভাল লাগছে না, তোমারটা দাও।" বলে মা'র গামছাটা টেনে নিয়ে আবীর স্নান করতে চলে গেল।

খেতে বসে কথায় কথায় বিজনবালা বললেন; "কাল একবার আমাদের জায়গাটা দেখে আসিস তো! শুনছি কে যেন গরু মোষ রেখে খাটাল করেছে।"

আবীর বলল, "কী হবে জায়গা দেখে!"

"বলিস কী! নিজেদের জায়গা। কত কষ্ট করে পাঁচ-সাত বছর আগে কিনেছি। এখন ওই জায়গার কত দাম।"

"বেচে দাও।"

বিজন ছেলের কথায় অবাক হলেন না। এইরকমই বলে ও। বললেন, "বেচে দিলে বুড়ো অবস্থায় থাকব কোথায়?"

"কী করবে তুমি ও-জায়গায়? বাড়ি?"

"মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে হবে না একটা!"

"কী হবে ব্যবস্থা করে, এই তো বেশ আছি।" আবীর বলল।

বিজন ছেলেকে দেখতে দেখতে বললেন, "তুই তোর বাবার চেয়েও এককাঠি। সে আর কিছু না করুক নিজের সুবিধে-অসুবিধে, স্বার্থ বুঝত। তুই তাও বুঝিস না।"

আবীর জলের গ্লাস তুলে নিয়ে মা'র মুখের দিকে তাকাল। বলল, "বুঝি। কিন্তু ও আমার ভাল লাগে না।"

৩

পরমার বসার ঘরে আবীর বসে ছিল। পরমা ঘরে নেই। আবীর বসে বসে ঘরটা লক্ষ করছিল। ছোট মাপের লম্বাটে ঘর হলেও তিন তিনটে জানলা। পুবের আর দক্ষিণের জানলাটা মোটা-মুটি একই মাপের, ভেতর দিকের জানলাটা ছোট, অন্য দুটোর মতন খড়খড়ি দেওয়াও নয়। ঘরে আসবাবপত্র খুব কিছু কম নয়। বেতের দুটো চেয়ার, দেওয়াল ঘেঁষে সরু একটা তক্তপোশ, ছোট মতন বেঁটে গোল-টেবিল একটা, এক কোণে বই রাখার মাঝারি আলমারি। আলমারির মাথায় পেতলের এক ফুলদানি আর টাইম-পিস ঘড়ি। এই ঘরেই পরমা কোথাও তার গ্রামোফোন রেখেছে, কোথাও বা টেবিল-পাখা। জিনিসপত্রের চাপে ঘরটাকে আরও ছোট মনে হয়। দেওয়াল প্রায় পরিষ্কার, একদিকে এক ক্যালেণ্ডার, অন্যদিকে কার যেন বাঁধানো ফটো। ঘর দোর, জিনিসপত্র বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে পরমা, অযত্ন অবহেলা চোখে পড়ছে না। সরু তক্তপোশটার ওপর চমৎকার এক সুজনি পাতা। আবীর যে-চেয়ারে বসে আছে—সেই চেয়ারে তুলোর পাতলা গদি। বসে থাকতে থাকতে আবীর এই সব লক্ষ করছিল এবং ভাবছিল, এই ঘর দেখে পরমাকে বেশ গোছানো বলেই মনে হয়, এলোমেলো স্বভাবের বা উদাসীন বলে মনে হয় না। অথচ বাইরে, রাস্তায় দেখলে পরমাকে অত নিস্পৃহ, অনাগ্রহী, উদাসীন দেখায় কেন! পরমা কি বাইরে একরকম, ঘরে অন্য? হতে পারে। হয়ত মেয়েরা এইরকমই হয়, পরমা আরও কিছুটা বেশি। আবীরের আবার এরকমও মনে হল, এই সব জিনিসপত্রের কিছু কিছু হয়ত পরমার আগেই ছিল, ফেলে বিলিয়ে বা নষ্ট করে দিতে না পেরে জমিয়ে রাখতে হচ্ছে।

যেমন বইয়ের আলমারি কিংবা টেবিল পাখাটা দেখে বেশ বোঝা যায়—এই দুটো জিনিসই পুরোনো, দু'এক মাসের মধ্যে জোটানো নয়। এমনও হতে পারে পরমা তার পুরোনো জিনিসের খুব অল্পই ফেলে এসেছে, যতটা পারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে, আর এই পুরোনো স্মৃতির মধ্যেই সে বেঁচে আছে। আবীর কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারল না।

পরমা ঘরে এল। বলল, "একলা একলা অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম।" বলতে বলতে পরমা তার হাতের ডিশ দুটো আবীরের সামনে নামিয়ে রাখল।

আবীর জানত, পরমা তাকে বসিয়ে রেখে চা-খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়েছে। কাঁচের পাতলা ফুল-তোলা ডিশের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবীর বলল, "এ কী! এত খাবারটাবার কেন?"

"আপনি খাবেন।" পরমা অক্লেশে ঘাড় হেলিয়ে মোলায়েম গলায় বলল।

"এ অনেক।"

"কিছু না তেমন। আমি চা নিয়ে আসছি।" পরমা দাঁড়াল না, চা আনতে চলে গেল।

আবীরের কেন যেন হাসি পাচ্ছিল। কাল ঘুসকি কোলিয়ারির কাছ থেকে বিনা ভাড়ায় পরমাকে বয়ে আনার জন্যে এই খাবার-টাবার নাকি! পরমা কি ভদ্রতা করছে, নাকি ঋণশোধ? ত্রিদিব, ভূষণ কিংবা বিভূতি যদি দেখে, আবীর পরমার ঘরে বসে কাঁচের ডিশে সাজানো খাবার চামচ দিয়ে তুলে-তুলে মুখে পুরছে—শালারা নিশ্চয় হার্টফেল করে মরবে। আবীর মজাটা ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল।

আবার এল পরমা, জলের গ্লাস আর চা নিয়ে এসে রাখল এবার। "কই, আপনি এখনও বসে আছেন যে!"

আবীর বলল, "আমি এত খেতে পারব না। সত্যি বলছি।"

"বেশ তো, যখন পারবেন না—তখন ফেলে দেবেন।" বলে

চোখের তারায় যেন হাসল পরমা।

তাকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল না, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যও যেন নেই। "আর একটিবার বসতে হবে, আমি আসছি।" বলতে-বলতে পরমা আবার চলে গেল।

আবীর একটু জল খেল। গলাটা শুকনো লাগছে। পরমার এই আতিথ্যে সে খানিকটা কৌতূহল বোধ করছে। এমন ঘরোয়াভাবে তাকে দেখা যাবে আবীর ভাবেনি।

পরমা এবার এসে ঘরে বসল। হাতে চায়ের কাপ।

আবীর ডিমের চপ জাতীয় খাবারটা খেতে খেতে বলল, "পশুপতি উকিল—মানে আমাদের পশুপতিবাবু আপনার আত্মীয়?" বলার মতন কিছু খুঁজে না পেয়েই যেন কথাটা শুধলো আবীর।

"না। কে বলল?"

"শুনতাম..."

"আমার কেউ নয়। তুলসীমামার জানাশোনা লোক।"

"তুলসীমামা—কালকের সেই বুড়ো মতন ভদ্রলোক, আপনার সঙ্গে ছিলেন—" আবীর চোখ তুলে পরমার পুরু সুছাঁদ গলা দেখল, আধখানা গলা।

পরমা মাথা নুইয়ে নাড়ল। হ্যাঁ, কালকের সেই ভদ্রলোক।

আবীর গতকালই শুনেছে, ওয়েলফেয়ার অফিসের সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোক তুলসীমামা। ওখানেই উনি থাকেন, কোয়ার্টারস আছে; পরমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কাল পরমা ওখানে দেখা করতে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে যায়। আবীরের ধারণা হল, তুলসীমামাই পরমার জন্যে এই বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সামান্য চুপচাপ থেকে আবীর বলল, "এই বাড়িটা অনেক পুরোনো।"

"বেশ পুরোনো; তবে এদিকটায় খোলামেলা আছে। ভাড়াটেও বেশি নেই। আমাদের দোতলায় জল নিয়ে যা কষ্ট একটু।"

"ভারিতে জল দেয় না?"

"দেয়। একটা হাত-পাম্প আছে; জল তেমন ওঠে না।"

আবীর বুঝতে পারছিল, এ-সব মামুলী কথা আর বেশিদূর এগুবে না। তাছাড়া, আবীর মোটেই জল, ভারি, ভাড়া নিয়ে ব্যস্ত নয়। তার অন্য রকম কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। যেমন জানতে ইচ্ছে করছিল পরমা আগে কোথায় ছিল? কী করত? তার কি স্বামী ছিল? সেই স্বামী কি সত্যিই খুন হয়েছে? কেন? পরমা এখানেই বা কেন এল হঠাৎ? চাকরির জন্যে? কৌতূহল এবং আগ্রহ যতই থাক, আবীর এ-সব কথা পরমাকে এখনই জিজ্ঞেস করতে পারে না।

পরমাই কথা বলল এবার। বলল, "আপনাদের আমি প্রায় রোজই এখানকার রাস্তাঘাটে দেখি। বন্ধু-বান্ধব সমেত।" বলে মৃদু করে হাসল পরমা। কথাটা সে কালও বলেছিল।

আবীরও হাসল। "আমরাও দেখি।" সে পুরো করে কথাটা বলল না; বলতে হলে আরও একটু বলতে হবে: আমরাও সবাই আপনাকে দেখি। আপনাকে নিয়ে গল্প করি। ভাবি। আমাদের কাছে আপনি মিস্টিরিয়াস ক্যারেকটারের মেয়ে।

পরমা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে আবীরের দিকে তাকাল। "আমায় কে যেন নীচের ভাড়াটেদের কেউ বলেছিল, আপনার মা···"

"ডাক্তার, লেডী ডাক্তার—" আবীর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হাসিমুখেই। তার আর খেতে ইচ্ছে করেছিল না। জল খেয়ে চায়ের কাপ তুলে নিল। "আমার মার একটা ডাক্তারখানা আছে, কারখানার দিকে। হাটের কাছাকাছি। এখান থেকে দূর অনেকটা; আপনি জায়গাটা চিনতে পারবেন না। নার্সারীর বাগানের দিকে গিয়েছেন কখনও?"

"গিয়েছি এক আধবার—"

"ওখানে হাট বসে।"

"হাটে যাইনি", পরমা হাসল।

আবীর চা খেতে খেতে এবার উসখুস করতে লাগল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাতে রাখল। যেন সিগারেট ধরাবার আগে সে সামান্য অপেক্ষা করে দেখছে।

পরমা জিজ্ঞেস করল, "আপনি প্রায়ই ট্যাক্সি চালান ?"

"না না, কেন ?"

"আর একদিন—কবে যেন—সেদিনও দেখছিলাম।"

আবীর হাসল। "মাঝে মাঝে চালাতে ইচ্ছে হয়।…গাড়িটা বিহুদার—আমাদের বন্ধুর মতন, কেড়ে নিয়ে চালাই।" আবীর ছেলেমানুষের মতন বলল।

পরমা আবীরের ছেলেমানুষী দেখে হাসির মুখ করল। বলল, "আপনি গাড়িটাড়ি বেশি চালাবেন না।"

"কেন ?"

"শখ করে গাড়িটাড়ি না চালানোই ভাল।"

আবীর কয়েক পলক লক্ষ করল পরমাকে। "কাল আপনার ভয় করছিল ?"

"তা করছিল খানিকটা", পরমা হালকা করে হাসল।

আবীরের ভাল লাগল না। তার মনে হল না, পরমার ভয় পাওয়ার মতন কিছু ছিল কাল। হয়ত সে একটু জোরেই এসেছে, এতে ভয় পাবার কী থাকতে পারে! অসুখী মনেই আবীর সিগারেট ধরিয়ে নিল।

পরমা তার চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রাখল। আজ পরমাকে সামান্য শুকনো দেখাচ্ছে, কানের পাশে কপালে কিছু চুল এলোমেলো হয়ে আছে বলে, নাকি তার গায়ের শাড়িটার জন্যে বোঝা যাচ্ছে না। শাড়ির রঙটা মুগা ধরনের, ম্যাটমেটে। পরমার চাপা ফরসা রঙের সঙ্গে শাড়িটা যেন মানাচ্ছে না। ম্লান করে দিচ্ছে। ক্লান্তির জন্যেও পরমাকে শুকনো দেখাতে পারে।

আবীর হঠাৎ বলল, "আপনি খানিকটা ভীতু ধরনের, না ?"

পরমা অন্যমনস্কভাবে আবীরের দিকে তাকিয়ে থাকল। জবাব

দিল না কথার। আবীর অপেক্ষা করে এবার হেসে বলল, "মেয়েদের ভয় বেশি হয়।"

পরমা যেন এবার খেয়াল করে কথাটা শুনল, বলল, "তা হয়ত হয়। মেয়েরা বেশির ভাগ সময় অসহায়।"

আবীরের বলার ইচ্ছে হল: না, সব সময় তার জন্যে নয়, এমনিতেই মেয়েরা ভীতু স্বভাবের, এটাই তাদের চরিত্র। কাল আপনি যখন ওভাবে আমার গাড়িতে এসে উঠলেন তখন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনার দুরন্ত সাহস রয়েছে, এবং বিশ্বাসও। গাড়িটা রাস্তায় খারাপ হয়ে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে ছিল, যদি এমন হত, গাড়িটা আর চলতে চাইত না—তাহলে ওই ফাঁকা রাস্তায় অচল গাড়ি, আমার মতন একটা ছেলে এবং সামনে সারাটা রাত পড়ে রয়েছে দেখে আপনি কী করতেন, আপনার কী অবস্থা হত কে জানে! এরকম হলে আপনার সাহস এবং বিশ্বাসের জোরটা বোঝা যেত। যাক্‌গে, আপনাকে সে ধাক্কা সামলাতে হয়নি। বেঁচে গেছেন।

পরমা গাল এবং কপালের উড়ো চুল হাত দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে-নিতে বলল, "ক্ষতির কথা ভেবেই ভয়। মেয়েদের ক্ষতি খুব তাড়াতাড়ি হয়, তাদের ভয়ও তাই বেশি।"

আবীর কিছু বলল না। পরমা কোন্ ক্ষতির কথা বলছে বোঝবার চেষ্টা করল। হতে পারে সে নিজের কথা মনে করেই বলছে। আবীর কি পরমাকে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করবে? ব্যক্তিগত এই প্রশ্ন পরমা কেমন ভাবে নেবে বুঝতে না পেরে আবীর ও ব্যাপারে কিছু বলল না। বরং কী মনে করে আবীর এবার হেসে ফেলল, বলল, "আপনি এখানকার মহিলা সমিতিতে নাম লিখিয়ে ফেলুন।"

পরমা বোধ হয় ঠাট্টা বুঝল, বুঝে সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল।

আবীর পরিহাস করে বলল, "আমাদের এখানকার মহিলা সমিতি

আপনাকে পেলে বর্তে যাবে। আমার মাকে বলব। মা সমিতির পুরোনো মেম্বার।” আবীর হাসতে লাগল।

পরমা হাসল। বলল, “আপনি কিসের মেম্বার?”

“আমি!···আমি কিছুর মেম্বার নই।···বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডার মেম্বার ছাড়া আমি কিছুতেই নেই।” বলে একটু থেমে আবীর আবার বলল, “কোথাও ভিড়ে থাকা আমার পোষায় না।”

পরমা যেন আবীরের চোখের দৃষ্টি লক্ষ করল। কিছু ভাবল। বলল, “আপনি কিছু করেন না?” এমন ভাবে কথাটা বলল পরমা যেন সে জানে আবীর কিছু করে না—তবু জিজ্ঞেস করছে।

আবীর বলল, “না”, বলে মাথা নাড়ল, “আমি পুরোপুরি বেকার।”

পরমা আবীরকে দেখছিল স্থির চোখে।

কী মনে করে আবীর নিজেই বলল, “আমার বন্ধু-টন্ধুরা কিন্তু বেকার নয়, ওরা কেউ মাস্টারী, কেউ কেরানীগিরিটিরি করে। আমিই কিছু করি না।”

পরমা বোধহয় খানিটা কৌতুক বোধ করল। বলল, “মাঝেসাঝে শখের ড্রাইভারি করেন।” বলে ঠোঁটের হাসি চাপল।

আবীর হেসে উঠল। “বাঃ, শুধু ড্রাইভারি কেন, আমি চঞ্চলের মনিহারী দোকানে অনেক সময় দোকানদারি করি। একবার আপনাকে গায়েমাখা সাবান আর মাথার তেল বিক্রি করেছি। কী সাবান তাও বলতে পারি···!”

পরমা যেন আর না পেরে সামান্য শব্দ করে হেসে উঠল।

আবীর পরমার হাসি দেখতে দেখতে মজার গলায় বলল, “ইন্ ফ্যাক্ট্—আপনার কাছ থেকে মাথার তেলটার দাম নিতেই আমার একটু ভুল হয়েছিল। কুড়ি পয়সা কম নিয়েছিলাম। চঞ্চল আমার কাছ থেকে পয়সাটা আদায় করে নিল।”

পরমা হেসে উঠল।

আবীরের হাতের সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল। বার দুয়েক টান

দিয়ে কোথায় যে সিগারেটের টুকরো ফেলবে স্থির করতে না পেরে চায়ের কাপের মধ্যে ফেলে দিল। ফেলার আগে পরমার চোখে-চোখে তাকিয়ে যেন বলে নিল, এর মধ্যেই ফেললাম।

হাসির ভাবটা কেটে গেলে পরমা বলল, "আমি অত লক্ষ করিনি, নয়ত কুড়ি পয়সা দিয়ে দিতাম। এখনও দিয়ে দিতে পারি।"

আবীর বলল, "আপনি লক্ষ-টক্ষ কমই করেন। রাস্তা দিয়ে যান—যেন কিছুই দেখছেন না। বাজারটাজারে যান তাও বোধ হয় দেখেনটেখেন না?"

"তা নয়", পরমা বলল, "দেখি, তবে—"কথাটা আর শেষ করল না।

অল্প সময় আর কোনো কথা হল না। পরমা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে ছিল।

শেষে আবীরই কথা বলল। বলল, "আগে আপনি কোথায় থাকতেন?"

পরমা নাম বলল, খানিকটা তফাতে অন্য এক মফস্বল শহরে থাকত পরমা।

আবীর এবার ইতস্তত করে বলল, "চাকরি করতেন?"

"না।"

স্বামীর কথাটা জানার উগ্র কৌতূহল হচ্ছিল আবীরের। কেমন করে প্রশ্নটা করা যায় তা ওর মাথায় আসছিল না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবীর বলল, "আপনাদের বাড়ি ওখানে?"

"না,—বাড়ি নয়। আমরা থাকতাম!" পরমা যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

আবীর আগ্রহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য পরে যখন মনে হচ্ছিল পরমা আর কিছু বলবে না, তখন অনেকটা আচমকা ভাবেই পরমা বলল, "আমার স্বামী ওখানে ছিলেন, চাকরি করতেন। একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে মারা যান।"

আবীর গভীর করে আরও কিছু সময় পরমার দিকে তাকিয়ে

থাকল। তার মনে হচ্ছিল, পরমা হয়ত এবার কী ধরনের ঝঞ্ঝাট তা বলবে। আবীররা শুনেছে, পরমার স্বামী খুন হয়েছিল। কী ধরনের ঝঞ্ঝাটে পড়লে মানুষ খুন হয় তা সঠিক ভাবে জানা না থাকলেও আবীর অনুমান করছে, নিশ্চয় বড় রকমের কিছু হবে, জটিল কিছু হবে। সেটা কী? কেমন? আবীর অপেক্ষা করতে লাগল। পরমা কিছু বলছিল না। পরে আবীর বুঝতে পারল, পরমা আর কিছু বলবে না। আবীরও জিজ্ঞেস করতে পারল না, কী ধরনের ঝঞ্ঝাট? প্রশ্নটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

অনেকদিনের এক চাপা কৌতূহল ও আগ্রহের অনেকটাই অবশ্য মিটল। আর সেটা মিটে যাওয়ার দরুন আবীর এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করল। অথচ সে বুঝতে পারছিল, শোনা কথা বা গুজব সত্য হওয়া সত্ত্বেও তার খুশী হবার কিছু নেই। সে উৎফুল্ল হচ্ছে না। বরং তার খারাপ লাগছে, অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। পরমার স্বামীর মৃত্যুতে তার শোক অথবা দুঃখের কিছু নেই, তবু আবীর অনুভব করল—অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির জন্যে না হলেও পরমার জন্যে সে দুঃখ বোধ করছে।

৪

আবীর কখনও ভাবেনি, পরমার সঙ্গে তার মুখের আলাপ কিংবা পরিচয় বেশিদূর গড়াতে পারে। একদিন নেহাতই ঝোঁকের মাথায় কিছু না ভেবে, কোনোরকম উদ্দেশ্য না নিয়ে সে পরমার গায়ের পাশে বিদ্যুৎদার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল; পরমা বাস্তবিকই সেই গাড়িতে এসে বসবে, কিংবা তার সঙ্গে এতটা পথ আসবে আবীর হয়ত তাও আশা করেনি। অথচ সেই ঘটনা থেকে ক্রমেই পরমার সঙ্গে তার কেমন এক আলাপ গড়ে উঠল। এ-রকম হওয়ার কোনো কারণ ওপর-ওপর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমার তরফে আবীরের সঙ্গে ভাব-বন্ধুত্ব করার কোনো কারণ থাকতে পারে এমনও মনে হয়নি। প্রয়োজনও বা কী তার! তবু এটাই আশ্চর্যের যে, দুজনের মধ্যে আলাপ আরও অনেকটা গড়িয়ে গেল। এবং তা হয়ত সামান্য দ্রুতই।

কার আগ্রহে এটা সম্ভব হল তা বলা মুশকিল। আবীরের আগ্রহ বেশি ছিল, পরমার কম—এমন বলা যায় না। কখনও কখনও পরমার আগ্রহই চোখে পড়ত। আবার আবীরও এমন কিছু করে ফেলত বা বলত যাতে মনে হবে তার উৎসাহই বেশি। যেমন আলাপের প্রথম দিকটায় আবীরকে খানিকটা সকাল-সকাল চায়ের দোকানে দেখা যেতে লাগল। সে বরাবরই দেরি করে বিছানা ছাড়ার ছেলে, ভোরে কাক পাখি ডাকার পরও তার রাত ফুরোতে চাইত না। বেলায় ঘুম ভাঙার অভ্যেসের জন্যে মার সঙ্গে আবীরের সকালে দেখা-টেখাও বড় হত না। তার চা খাবার নষ্ট হত। মা বকাবকি করত। আবীরই ঠিক করে ফেলেছিল, সকালের চা সে দোকানে গিয়ে খাবে। সেই আবীরও পরমার জন্যে ঘুম থেকে খানিকটা সময় অক্লেশে বাদ

দিয়ে দিল। চায়ের দোকানে সময় মতন গিয়ে আবীর বসে থাকত, চা-সিগারেট খেত, বন্ধুবান্ধবরা থাকলে গল্পসল্প করত। তারপর পরমার অফিস যাবার সময় হলে কোনোদিন রাস্তায় নামত, কোনোদিন চায়ের দোকানেই বসে থাকত। পরমার সঙ্গে তার চোখাচুখি হত। আবীর এমনভাবে তাকাত, যেন মনে হত সে হেসে বলছে: 'অফিস চললেন নাকি?' পরমার চোখে বা মুখে এ-সময় তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় থাকলেও লুকোনো একটু হাসি থাকত, যার অর্থ: 'হ্যাঁ, যাচ্ছি—', কিংবা 'কী ব্যাপার, রোজ সকালেই যে দেখা হচ্ছে!' আবীর মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে একটু রগড়ও করত, পরমা কাছাকাছি এলে হাতের সিগারেটের টুকরোটা এমনভাবে ছুঁড়ে দিত যে সেটা পরমার প্রায় সামনে দিয়ে ধনুকের মতন বেঁকে ওপাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ত; কখনো সখনো আবার চারপাশ দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলত: 'বড্ড রোদ, ছাতা কই?'

বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে পরমাই যেন আবীরকে খুঁজতে-খুঁজতে ফিরত। সাধারণ চোখে এটা বোঝার উপায় ছিল না, কেননা হাবেভাবে চলনে কোনো ব্যতিক্রম পরমার ছিল না। কিন্তু আবীর এটা বুঝত, বা বুঝতে শিখেছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারত, পরমা যখনই রাস্তার মধ্যে মুখ তুলে একেবারে অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখন বাস্তবিকপক্ষে সে আবীরকে খুঁজছে। আবীরকে দেখার পর পরমা চোখের দৃষ্টি অন্যরকম করে নিত। খুশী হবার মতন না হলেও সন্তুষ্ট হবার মতন নিশ্চয়।

কয়েকটা দিন এই রকম চোখে চোখে পরস্পরের খোঁজ নেওয়া, কিংবা আলাপের পর্ব চললেও দুজনের মধ্যে ওরই মধ্যে আবার দেখা সাক্ষাতও ঘটে যাচ্ছিল।

একদিন আবীর নিজেই পরমার বাড়ি গেল।

"আমাকে মুটে ভাড়া দিতে হবে—" ঘরে পা দিয়ে আবীরই প্রথমে হেসে বলল।

পরমা বোঝে নি। অবাক হচ্ছিল। "মুটে ভাড়া! কিসের?"

"মোট বয়ে আনলে ভাড়া লাগে।"

পরমা লক্ষ করে দেখল আবীরের হাতে কিছু নেই ; আশেপাশে কোথাও কিছু রেখেছে—তাও নয়। একটু ভেবে পরমা হেসে বলল, "মোট কোথায় যে মুটে ভাড়া দেব।"

আবীর পকেটে হাত ঢোকাল ; তারপর একপাতা সেফ্‌টিপিন, পাউডারের একটা পাফ বের করে পরমার দিকে এগিয়ে দিল।

পরমা হেসে ফেলল। "এই বুঝি মোট ?"

আবীর হাসিমুখে জবাব দিল, "ওজন না থাকলে মোট হয় না, না ? এবার একদিন একবস্তা চাল ফেলে আসবেন, মাথায় করে বয়ে আনব।"

সকৌতুক মুখ করে পরমা আবীরের কথা শুনল। বলল, "বসুন।"

আবীর বসতেই চাচ্ছিল, বসে পড়ল। "চঞ্চলের দোকানে জিনিস কিনে এগুলো ফেলে এসেছিলেন। আমি নিয়ে এলাম।"

পরমা বলল, "আমার মনে পড়ছিল না। একবার মনে হচ্ছিল কিনেছি, আবার মনে হচ্ছিল কিনি নি। অনেকগুলো জিনিস নিয়েছিলাম তো, খেয়াল করতে পারছিলাম না।"

কাল সন্ধ্যেবেলা পরমা চঞ্চলের মনিহারী দোকান থেকে মাথার তেল, সাবান, টুথপেস্ট, স্নো, পাউডার—এই রকম সব জিনিস কিনেছিল সাংসারিক। তার মধ্যে একপাতা সেফ্‌টিপিন, পাউডারের একটা পাফও ছিল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসার সময় সে ভুল করে ও দুটো দোকানে ফেলে এসেছে। চঞ্চলেরও খেয়াল হয় নি, দোকানে অন্য-অন্য খদ্দেরও ছিল। পরে চঞ্চলের খেয়াল হয়েছে, তখন আর পৌঁছে দেওয়ার উপায় নেই। আজ সকালে আবীর চঞ্চলের দোকানে যাবার পর ব্যাপারটা শুনল। শুনে বলল, রেখে দে আমি সন্ধ্যেবেলায় ও-বাড়ি যাব, দিয়ে আসব। চঞ্চল জানত, আবীর এমন পছন্দসই কাজটা যথেষ্ট খুশী হয়েই করবে। তবু ওই সুযোগটা হাতে রেখে চঞ্চল আবীরের কাছ থেকে চা ওমলেট সিগারেট খেয়েছে।

আবীর হেসে বলল, "জিনিসপত্তর কেনার সময় আপনি একটু খেয়াল টেয়াল করার চেষ্টা করুন।"

পরমা পাল্টা বলল, "জিনিসপত্তর বেচার সময় আপনিও খানিকটা খেয়াল করবেন।"

"আমি? আমি কাল চঞ্চলের দোকানে ছিলাম না। আমি কিছু বিক্রী করি নি।"

"কালকের কথা কে বলছে! আপনিই বলেছেন, মাথার তেল বেচতে গিয়ে আপনি একবার আমার কাছে কুড়ি পয়সা কম নিয়েছেন।"

আবীর জোরে-জোরে হেসে উঠল। "ওটা ভুল। আমি তেলের দামটা ঠিক জানতাম না।"

হেসে পরমা বলল, "এটাও আমার ভুল। কে আর সেফটিপিনের অত খেয়াল রাখে!"

আবীর তুড়ি বাজাবার মতন আঙুলে শব্দ করল; বলল, "ছেড়ে দিন, ভুলে ভুলে কাটাকুটি। এক গ্লাস জল খাওয়ান।"

"খাওয়াচ্ছি।...চাও খান।"

"দিন, ওটাই মুটে ভাড়া।" আবীর হাসিমুখে বলল।

পরমা নরম করে হাসল, হেসে অন্য ঘরে চলে গেল।

চা খেতে খেতে দুজনে এলোমেলো কথা বলল খানিক, গল্প করল। শেষে পরমাই লঘু ভাবে বলল, "আপনি ওভাবে আমার সামনে সিগারেট ছোঁড়েন কেন? জ্বলন্ত সিগারেট, মুখে ছিটকে এসে পড়লে ছেঁকা খাব যে!"

আবীর মাথা নাড়ল। "নেভার। আমি আপনার দিকে সিগারেট ছুঁড়ি না।"

"তবে ওটা কী করেন?"

"ওটা—" আবীর দু মুহূর্ত ভাবল, বেশ সপ্রতিভ ভাবে আঙুলের ভঙ্গি করে বলল, "সিগারেটের টুকরোটা যেভাবে আর্চ হয়ে যায়, দেখলেই বুঝতে পারবেন, তাতে গায়ে লাগার কথা নয়। ওটা

আসলে আপনাকে গার্ড অফ্ অনার দেওয়া।" বলতে-বলতে আবীর হো হো করে হেসে উঠল।

পরমাও হেসে ফেলল ; সামান্য শব্দ করেই হাসল।

"আমি অনারের লোক?" পরমা কৌতুকের গলায় জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়।"

"কী করে?"

"আরে ব্বাপ—, আপনি অনারের লোক নন। আমাদের এখানে সকলে আপনাকে বেজায় খাতির করে।"

"কেন? আমি কী?"

"সেটা বলা মুশকিল। তবে ডেফিনেটলি আপনি আমাদের পাড়ার এলা-বেলা নন। প্রেস্টিজ নিয়ে হাঁটেন, মশাই…"

পরমা উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

এরই দিন তিনেক পরে, বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাবের মধ্যে পরমা অফিস থেকে ফেরার পথে আবীরকে দেখতে পেয়ে চোখের ইশারায় ডাকল।

আবীর কাছে আসতে পরমা সহজ গলায় বলল, "খানিকটা পরে বাড়িতে একবার আসবেন?"

নিতান্ত কিছু বলতে হয়, আবীর বলল, "দরকার?"

পরমা এমনভাবে মাথা হেলাল যে দরকার না অ-দরকার—কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বলল, "আসুন না…।"

সন্ধ্যের খানিকটা পরে আবীর পরমার বাড়ি গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল, প্রায় ইলশে গুঁড়ি ধরনের। এ-রকম বৃষ্টি এ-সময় হতেই পারে ; যদিও এখন বর্ষা নয়, হেমন্ত চলছে, কার্তিকের শেষ, সামনেই শীত—তবু পালানো বর্ষা যেন এখনও আচমকা এক আধ বেলার জন্যে ফিরে আসে। বাদলার সঙ্গে বাতাসও ছিল, এলোমেলো বাতাস।

আবীর একটু আধটু ভিজেছিল। সেটা কিছুই নয়। মাথার চুলে জলের গুঁড়ো, জামায় সামান্য স্যাঁতসেঁতে ভাব।

পরমা বলল, "ভিজে এসেছেন। মোছবার কিছু এনে দিই।"

"না না," আবীর মাথা নেড়ে আপত্তি করল, "ভিজি নি। দু চার ফোঁটা জল গায়ে লাগলে তাকে ভেজা বলে না।"

তবু পরমা একটা সাদা শুকনো তোয়ালে এনে দিল। আবীর মাথা মুছল না, নেহাতই পরমার তাগাদায় মুখের জল মুছে তেয়ালেটা চেয়ারের পাশে রেখে দিল।

পরমা বলল, "মাথাটা মুছুন।"

আবীর বলল, "আমার মাথা একেবারে মোছা—ড্রাই···।" বলে আবীর ডান হাতের মজার এক ভঙ্গি করল।

হেসে ফেলে পরমা বলল, "কথা শিখেছেন বেশ। কিন্তু অসময়ের এই বৃষ্টিতে ভিজলে শরীর খারাপ হতে পারে।"

"হবে না," আবীর পরমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে মাথা নাড়ল। "শরীরের নাম মহাশয়—তা জানেন তো! আপনাদের দেখেছি ব্যাপারটাই আলাদা—কোনো কিছুই সইবেন না। একটু গরম হলেই বৃষ্টি-বৃষ্টি করবেন, খানিক বৃষ্টি হলেই রোদ-রোদ করবেন; দু ফোঁটা জল গায়ে লাগালে কে মরে! ভগবানের সমস্ত ট্রাবল্‌টা এখানেই, কোনো কিছু দিয়েই আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারছেন না—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—।"

পরমা ঠাট্টার গলায় বলল, "ভগবানের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে বুঝি?"

আবীরও পালটা পরিহাস করে বললে, "হয় মাঝে মাঝে, ভদ্রলোক ফেড্‌ আপ।"

পরমা হাসতে-হাসতে চলে গেল; বলে গেল, আসছে এখুনি।

বসে থাকতে-থাকতে আবীর একটা সিগারেট ধরাল। পরমা তাকে কেন ডেকেছে সে বুঝতে পারছে না। নানা রকম অনুমান করছে আবীর; পরমা হয়ত কোনো কাজে ঘুসকি কোলিয়ারীর দিকে সেই বাড়িতে যাবে, তার ট্যাক্সি চাই; হয়ত পরমা এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় একটা বাড়ি খুঁজে দিতে

বলবে। কিংবা একটা চাকরবাকরও খুঁজে দিতে বলতে পারে। চাকর খোঁজার কথা বললে আবীর বলবে, আমাকেই রেখে নিন, আমি পুরোপুরি বেকার, আই বেগ্ টু অফার···। নিজের মনেই হেসে উঠল আবীর।

সামান্য পরে পরমা এল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আবীর বলল, "ডেকেছেন কেন, বলুন?"

পরমা মুখোমুখি বসেছিল। বলল, "এমনি।"

"এমনি।"

"এমনি ডাকতে নেই?"

"আমি ভেবেছিলাম কোনো দরকার আছে।"

"তাও থাকতে পারে।"

"কী দরকার?"

"তেমন জরুরী কিছু নয়।" পরমা প্রয়োজনের বিষয়টা যেন খুবই সাধারণ বলে এড়িয়ে গেল। সামান্য পরে বলল, "আপনি কি সারাদিন রাস্তায় ঘোরেন?"

"দুপুর আর রাত্রি বাদে," আবীর বেশ গম্ভীর মুখে বলল।

চোখে চকচকে হাসি নিয়ে পরমা বলল, "সারাদিন রাস্তায় ঘুরতে ভাল লাগে?"

আবীর পরমার চোখেচোখে চেয়ে থাকল মুহূর্ত কয়েক; বলল, "অভ্যেস। আমরা বরাবর এই ভাবে ঘুরছি—।"

"বাড়িতে মা কিছু বলেন না?" কৌতুক করে পরমা শুধলো।

"আরে ব্বাস, বলে না কী—! বলতে বলতে জিব মোটা হয়ে গেছে। এখন আর আওয়াজ বেরোয় না। রেকর্ড খারাপ হয়ে গেছে।"

মুখের সামনে হাত আড়াল দিয়ে পরমা হাসল। "মাকে নিয়েও আপনার ঠাট্টা।"

আবীর সহাস্য মুখে বলল, "মার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বন্ধুর

মতন। মা আমার ফ্রেণ্ড্। আমাদের দুজনে যা হয় সে আপনি ইমাজিন করতে পারবেন না।"

"তা ঠিক।"

"কী?"

"ওই যে বললেন, ভাবতেই পারব না।"

আবীর হেসে ফেলল। পরে বলল, "আপনার মা নেই?"

"না"—পরমা মাথা নাড়ল।

"বাবা?"

পরমা আবার মাথা নাড়ল, বাবাও নেই।

আবীর তাকিয়ে থাকল অন্যমনস্কভাবে। মা নেই, বাবা নেই, স্বামী নেই; কেউ নেই পরমার। তা হলে পরমা একেবারেই একা। এই ধরনের কথার পর যে দুঃখ কিংবা অস্বস্তির ভাবটা আসে, বা আসতে পারে—সেটা কাটাবার জন্যে আবীর আচমকা বলল, "আপনি একেবারে অনাথ দেখছি, আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা।"

পরমা কিছু মনে করে নি, সহজভাবেই মাথা নাড়ল সামান্য।

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল আবীর। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি এখনও হচ্ছে কি না বোঝা যায় না, এ ঘরের খোলা জানলা দিয়ে কিছু দেখার বা বোঝার উপায় নেই। জানলার দিকে সামান্য তাকিয়ে থাকল আবীর, চোখ ফিরিয়ে নিল, পরমার মুখ দেখল। তারপর হেসে বলল, "সেই একটা গান আছে না—একলা চলো, একলা চলো রে—, আপনিও সেই রকম। মনের খুব জোর দরকার।" বলে আবীর ডান হাতে শক্ত করে মুঠো পাকালো জোরটা বোঝাবার জন্যে।

পরমা কিছু বলল না।

"আমার মারও এই রকম—সাঙ্ঘাতিক মনের জোর," আবীর বলল, বলে থামল একটু, "মিলিটারী ফিলিটারী, হাসপাতাল, লেখাপড়া—কত কী করেছে। একদিন মার গল্প বলব আপনাকে।"

পরমা লক্ষ করল, মার কথায় আবীরের মুখ যেন আরও একটু উজ্জ্বল দেখাল।

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো, হালকা কথাবার্তা হল। তারপর আবীর বলল, "সত্যিই আপনার কোনো দরকার নেই, শুধু শুধু ডেকেছিলেন?"

কিছু ভাবল পরমা, বলল, "না, দরকার কিসের; এমনিই আসতে বলেছিলাম। একটা দরকার হবে, হলে বলব।"

"কী দরকার?"

"এখন বলে কী হবে, দরকার হোক আগে।"

"বাড়ি বদলাবেন?" আবীর হেসে বলল।

"এখন নয়।"

"চাকর জোগাড় করে দিতে হবে?"

"না; আমার বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে সে বেশ ভাল।"

"তা হলে জলের ভারী পালটানো—"

পরমা হেসে ফেলল। "আপনি কি পাড়ার লোকের বেগার াটেন?"

"না, কখনো নয়—" আবীর মাথা নাড়ল, "তবে আপনার বেলায় াটতে পারি।"

"আমার বেলায় কেন?" চোখ সামান্য বাঁকা করে তাকাল রমা।

কী বলবে না-বলবে বুঝতে না পেরে আবীর বলল, "আপনি নাথ, একলা চলো পার্টি…"বলে হো হো করে হেসে উঠল।

পরমাও হেসে ফেলল শব্দ করে।

আবীর যখন চলে আসছে পরমা বলল, "দরকার পড়লে ডাকব; া পড়লেও যখন ইচ্ছে হবে আসবেন, আমি তো একলাই থাকি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আবীর বেশ খুশীর গলায় 'একলা লো' লাইনটা গেয়ে উঠল, তারপর রাস্তায় নেমে হাসতে লাগল।

ভূষণ একদিন বন্ধুদের মধ্যে বললে: "দেখ আবীর, সব জিনিসের কটা ইনার প্রসেস্ আছে, ওপর থেকে শালা কিছ্ছু বোঝা যায় না।

যেমন ধর, তুই কবে একটা আমের আঁটি চুষে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিস, তারপর আর দেখিসই নি, হঠাৎ একদিন দেখলি—অনেকদিন পরে দেখলি, মাটিফাটি চাপা পড়ে কবে শালা সেই আঁটি একটা ডালপাতা বের করে দিব্যি আমগাছের চারা হয়ে গেছে···ব্যাপারটা এই রকম আর কি—"

ত্রিদিব বলল, "লিচুর বিচিটিচিতেও এরকম হয়—।"

বিভূতি বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে নিয়ে পারা যাবে না ত্রিদিব, তুই ড্রয়িংমাস্টার, ড্রয়িং-মাস্টারের মতন থাকবি, এসব বড় কথায় তোর নাক গলানো কেন? কথাবার্তা নেই একটা লিচুর বিচি এনে পুঁতে দিলি। হোপ্‌লেস্···!"

ত্রিদিব বিনয়ের ভাব করে বলল, "বেশ ভাই, আমি উইথ্‌ড্র করছি, তোমরা অন্য বিচি পুঁতে ফেল।"

আবীর ভূষণের কথাটা ভাবছিল। এটা ঠিকই যে, চোখের অসাক্ষাতে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে সংসারে; ভূষণ আরও বাহারী করে বললে বলতে পারত—এইভাবে অনেক বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, অনেক শুকনো ডালে আবার পাতা আসছে, অজান্তে কত কুঁড়িও ধরছে ফুলের। কিন্তু সে-সবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি সত্যিই আছে?

আবীর বলল, "দূর, এ অন্য কিছু···! তেমন ব্যাপার কেন হবে?"

ভূষণ বলল, "অন্য কী হতে পারে!···ফরনাথিং ওই বরফ গলে যাচ্ছে? নেভার।" ভূষণ মাথা নাড়ল জোরে জোরে।

বিভূতি বলল, "আমার মনে হচ্ছে, বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি করে করে পরমা ফেড্ আপ্। পাগলা হয়ে গেছে। কতকাল একটা টগবগে মেয়ে একা-একা থাকতে পারে, তার একজন কম্প্যানিয়ান দরকার বাবা, সে যতই যেমন হোক।"

আবীর কিছু বলল না। পরমাকে সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। হতে পারে এখানে এসে পর্যন্ত পরমা একা-একা থাকতে-থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ-রকম ক্লান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু

নয়। কিন্তু পরমা যদি সেই রকম ফাঁকা কিংবা শূন্যতাই অনুভব করবে তবে বাড়িতে, পাড়ায়, কিংবা অফিসে সে তার বাক্যালাপের সঙ্গী নিশ্চয় খুঁজে নিতে পারত, আবীরের জন্যে বিশেষ আগ্রহ বা পছন্দের কোনো কারণ ছিল না। আবীর নিজেকে ঠিক এই ধরনের কোনো মেয়ের সঙ্গী হিসেবে ভাবতে পারে না। বরং আবীর বেশ বুঝতে পারছে, পরমার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলতে কিংবা গল্প করতে তার অসুবিধে হয়। সব সময় ভেবে চিন্তে, মুখ সামলে, ভদ্র এবং শালীনভাবে কথা বলার অভ্যেস তার নেই। পরমার কাছে আবীর মন খুলে কথা বলতে পারে না। তবু, এটা ঠিক, আবীর ক্রমশ বুঝতে পারছে, সে পরমার এক ধরনের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে আবীর খানিকটা বিরক্তিই অনুভব করে, এও এক রকমের বাঁধা পড়ে যাওয়া—; শালা, স্লেভারী—! হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই। যেমন সেদিন বিকেলে আবীরের সঙ্গে শঙ্কুর দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়, শঙ্কু তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বলেছিল, চ' আজ শালা অনেক পার্টি আসবে—টুক্‌লু দুটো পুরো আনবে, খাস বিলেতী। কিন্তু ইচ্ছে সত্ত্বেও আবীর যেতে পারল না, কেন না সন্ধ্যেবেলায় পরমাকে হীরাপুরে নিয়ে যাবার কথা ছিল। পরমা চোখ দেখাতে যাবে। তার চোখে আজ ক'দিন হল কী হয়েছে, থেকে থেকে ঝাপসা হয়ে আসছে, জল এসে পড়ছে, তারপর আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এই রকম হচ্ছে দিনের মধ্যে ক'বার করেই। আবীর পরমাকে বলেছিল, হীরাপুরে বোস-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। শঙ্কুকে ছেড়ে পরমার সঙ্গেই যেতে হল। আরও কিছু-কিছু উদাহরণ আবীর দিতে পারে, যা থেকে বোঝা যাবে আবীর পরমার জন্যে তার—নিজের পছন্দ, ভাল লাগা, আড্ডাফাড্ডাও ইদানীং কখনো-সখনো বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছে।

শেষে ভূষণ বলল, "যাই হোক, আসল কথা হল, তোকে বেশ পছন্দই করে ফেলেছে, পরমা। ভাগ্যমন্ত লোক তুই।"

ত্রিদিব হেসে বলল, "আমাদের নিয়ে চল, গপ্পটপ্প করে আসি।"

আবীর হেসে বলল, "নিয়ে যাবার কী আছে! সেরেফ্ চলে যা। দরজা খোলা…।"

"দরজা খোলা! তারপর পা বাড়ালেই দেখব, তুমি শালা মদনচাঁদ দরজার ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে গেট্ পাস চাইছ!"

আবীর হো হো করে হেসে উঠল, হাসতে-হাসতে বলল, "না, আমি চাইব না, তোরা বেশি-বেশি ভাবছিস! আমি কারও দরোয়ান নই।"

বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, হাসিঠাট্টার সময় পরমার কথা উঠলে আজকাল এই রকমই হতে শুরু হয়েছিল। ওরা কেউ পরমার এই আচরণের পরিবর্তন বুঝতে পারত না, অনুমান করার চেষ্টা করত মাত্র। আজও যখন পরমা একা একা অফিস যায়, কিংবা ফেরে, কি দোকান-বাজারে আসে—মনেই হয় না এই পরমার কোনো পরিবর্তন হয়েছে। অবিকল সেই ভাবে হেঁটে যায়, সেই রকমই উদাসীন দৃষ্টি, সব কিছু উপেক্ষার ভাব, মুখে সামান্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিষণ্নতা মেশানো; অথচ আবীরের মুখ থেকে শুনলে মনে হয়, পরমার এই আচরণ যতটা বাহ্য ততটা আন্তরিক নয়। রাস্তায় যে-পরমাকে দেখা যায়, ঘরে সেই পরমা অনেকটা অন্য রকম; এখানে তাকে যতই একা, নিঃসম্পর্ক, আগ্রহহীন, এমন কি অহঙ্কারীও মনে হয়, বাড়িতে পরমা বাস্তবিক তা নয়। তার বেশির ভাগটাই নয়। ভূষণ তাই একরকম সন্দেহ করে, বিভূতি অন্যরকম। সুরপতি খোঁজখবর করে দেখেছে—অফিসেও পরমা তার নিজের মতন করে থাকে, তার আলাপী তেমন কেউ নেই, প্রয়োজনের বেশী কথাবার্তাও বলে না, তবু তার আচরণ এত শিষ্ট, শালীন, নম্র যে পরমাকে অপছন্দ করার লোক তেমন কেউ অফিসে নেই।

কিছুদিন এইভাবে বন্ধুদের নানারকম অনুমান চলল। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে ভূষণ একদিন বলল, "দূর—এসব ভেবে লাভ নেই। মেয়েছেলের চরিত্র নিয়ে কোনো ক্যালকুলেসান হয় না। ভগবানই পারল না তো আমরা! ছেড়ে দাও। ব্যাপারটা আবীরের,

ও বেটাই ভাবুক, আমরা কেন ফরনাথিং মাথা ঘামাই। নো মোর পরমা।”

আবীর একদিন দেখল, বন্ধুমহলে পরমা প্রসঙ্গটা একনাগাড়ে-অনেকদিন-খেলা ময়লা ছেঁড়া তাসের মতন কোন্ কোণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর কারও উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই।

এর জন্যে আবীর দুঃখিত হল না, বরং সে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করল। ইদানীং পরমার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন অন্তরঙ্গ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে সেসব গল্প বন্ধুদের কাছে করতে তার ইচ্ছে করত না।

৫

এই শহরে এবার শীত এসে পড়ছিল। শীত এসে পড়লে, আবীর বরাবরই দেখেছে, শহরটা যেন সারা বছরের একটানা কাজকর্ম সেরে দু'দণ্ড জিরিয়ে বসার মতন অলস হয়ে ওঠে। বেশ দেখায় শহরটাকে। সকালে কোনো-কোনোদিন কারখানার ধোঁয়া জমে-জমে যদি বা একটু আবিল ভাব থাকে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সে-আবিলতা কেটে যায়। তারপর রোদ, অফুরন্ত রোদ সারাদিন। ওই রোদে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কখনো কোনো গাছ শীতের বাতাসে কেঁপে উঠছে, কখনো পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে রাস্তাঘাটে। স্কুলের খেলার মাঠ থেকে বাতাসে-ওড়া ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতন প্রজাপতি উড়ে আসে, কখনো বা ফড়িং। কোথাও থেকে টুনটুনি, ফিঙের দল এসে পড়ে, গাছে গাছে ওড়ে; শহরের সীমানায় সবজি ক্ষেতগুলো সবুজ হয়ে থাকে। তকতকে ভাব হয়ে ওঠে শহরটার। সকাল থেকে ধুনুরির দল হেঁকে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, দুপুরে কান পাতলে কোথাও না কোথাও ধুন্ ধুন্… ধুন্…শব্দ শোনা যাবে তুলো ধোনার। আবীরের এই শব্দটা খুব পছন্দ। এই শব্দ কিংবা কাঠুরেদের কাঠ কাটার শব্দ শুনলে তার মনে হয়, আবীর কোনো জন্মে এই রকম কিছু ছিল।

শীতের সঙ্গে যদিও কোনো সম্পর্ক নেই তবু আজকাল আবীর তার ভাল লাগা এবং মনের ঝরঝরে ভাবের মধ্যে মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এক-একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেলে সে লেপের তলায় শুয়ে-শুয়ে মার গলা শুনতে-শুনতে ভাবত, সে পরমার গলা শুনছে। অন্যমনস্কতার মধ্যে মার গলা এবং পরমার গলা সে প্রায়ই ভুল করত। ভুল শোধরাবার উপক্রম হলেই আবীর মনে মনে একরকম খেলা খেলত যেটা একেবারেই ছেলেমানুষী। সে

কখনো লেপের তলায় মুখ চাপা দিয়ে, কখনও লেপ সরিয়ে একবার মা অন্যবার পরমার মতন করে কথা বলত এবং দুজনের মধ্যে এলোমেলো ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে এক সময় লেপটা গা থেকে টান মেরে ফেলে দিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াত। দেখত পরমা অফিস যাচ্ছে কিনা। কোনোদিন দেখতে পেত, কখনও পেত না। আবার এক একদিন বাড়ি থেকে মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে সে ইচ্ছে করেই রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াত, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পরমার অপেক্ষা করত, তারপর পরমাকে দেখতে পেলে চেনাশোনা কোনো রিকশাঅলাকে বলত "দাঁড়া, তোর ভাড়া করে দিচ্ছি", বলে তার রিকশার হর্ন অনবরত টিপে যেত। পরমা কাছাকাছি এলে আবীর এক পলক চোখাচুখি সেরে একেবারে অন্যদিকে মুখ করে সরে যেত। পরমা যখন রিকৃশায়, আবীর তখন চায়ের দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। চায়ের দোকানে বসে চা খেতে-খেতে খুশীখুশী মনটা আচমকা আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। কেন হত আবীর বুঝত না। বুঝত না বলে তার অনেকক্ষণ আর কিছু ভাল লাগত না, চায়ের দোকান ছেড়ে কখনও চঞ্চলের মনিহারী দোকানে চলে যেত, কখনও স্টেশনের দিকে, কখনও বা ধুনুরিপাড়ায়। ধুনুরিপাড়ায় গেলে আবীর সেই শব্দটা শুনতে পেত, তুলো ধোনার শব্দ—ধুন্ ধুন্···ধুন্···।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পরমার বাড়ি যাবার সময় আবীর দেখল বসন্তবাবুদের বাড়ির ফটক খোলা, বাগানের সামনেটা অন্ধকার। আবীর খোলা ফটকের সামনে এসে মনোহরমালীকে খুঁজল, দেখতে পেল না। না পেয়ে সে বাগানে ঢুকে পড়ল। এখন এই বাগানে গোলাপ ফুটছে। মালীর কাছে আবীর কয়েকটা গোলাপ চেয়েছিল, পরমাকে দেবে বলে। মালী বলেছিল, দেব। মালী নেই, ফটক খোলা, বাগান অন্ধকার—অগত্যা আবীর নিজেই গোলাপ গাছ খুঁজে নিল। কয়েকটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে সে যখন চলে আসছে, দেখল, বাড়ির দিক থেকে রাস্তা ধরে রিকশা চেপে মা আসছে। আবীর বড়-বড় পা ফেলে ফটক পেরিয়ে রাস্তায় এসে

গেল। মাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে আবীরের মনে হল, বসন্তবাবুদের বাড়ির কোনো বউঝির জন্যে মা এসেছিল। কার কী হয়েছে আবীর জানে না, তবু তার ধারণা হল, আজ কাল কিংবা পরশু বসন্তবাবুর বাড়িতে একটা বাচ্চাকাচ্চা জন্মাবে, আর একটা গোটা দিন কিংবা রাত মাকে এবাড়িতে পড়ে থাকতে হবে। তারপর মা যখন বাড়ি ফিরবে মার মুখ দেখলে আবীর বলে দিতে পারবে, বাচ্চাটা হয় বিকলাঙ্গ না হয় অন্য কিছু হয়েছে। এ-বাড়িতে স্বাভাবিক শিশু বড় জন্মায় না, অথচ এ-বাড়ির বাগানে বরাবরই ভাল গোলাপ, চাঁপা, টগরফগর ফোটে। আশ্চর্য!

পরমার বাড়িতে এসে আবীর বুঝতে পারল তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কাঁটা ফুটেছে। জ্বালা করছিল। বার কয়েক দাঁত বসিয়ে জায়গাটা সে টেনে-টেনে চুষলো। জ্বালা গেল না।

পরমা বলল, "বাঃ, চমৎকার গোলাপ। পেলে কোথায়?" পরস্পরকে ওরা আজকাল 'তুমি' বলতে শুরু করেছে।

আবীর বললে, "চুরি।"

"চুরি?"

"বসন্তবাবুর বাড়ির বাগান থেকে। ওদের বাগানে একসময় খুব ফুল হত। আমরা হরদম চুরি করতাম। আজকাল আর তেমন ফুলটুল হয় না।"

ফুলগুলো হাতে ছিল পরমার। বলল, "এখনও লোকের বাড়িতে ঢুকে দিব্যি ফুল চুরি করছ! নাঃ, তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না—!"

আবীর বলল, "এটা এমন কিছু পুকুর-চুরি নয়। দু-চারটে ফুল মানুষ চুরি করেই থাকে।...লাভের মধ্যে আমার আঙুলটা গেল!"

"কী হয়েছে?"

"জোর কাঁটা ফুটে গেছে। অন্ধকারে কি দেখা যায়—!"

পরমা হেসে ফেলল। বলল, "তুমি ভাল জাতের চোর নও, ভাল চোররা অন্ধকারেই আরও পরিষ্কার দেখতে পায়।...কই,

দেখি?” পরমা আবীরের আঙুলটা দেখল, বলল, “গর্ত করেই ফুটেছে মনে হচ্ছে। কিছু দেবে? আইডিন?”

“ধ্যুত…। ছেড়ে দাও, ও নিজের থেকেই সেরে যাবে।”

“তা যাবে”, পরমা যেন কৌতুক করে মাথা নাড়ল।

আবীর আঙুলটা আরও একবার দাঁত দিয়ে টিপে জোরে-জোরে চুষে নিল। তারপর হেসে বলল, “সেই লাইনটা কী? স্কুলেটুলে পড়েছি : গোলাপে কাঁটা আছে। চাঁদে কলঙ্ক, কুসুমে কীট…”

ফুলগুলো রেখে দিতে-দিতে পরমা আড়চোখে চেয়ে মজার গলায় বলল, “তুমি স্কুলেও পড়েছ নাকি?”

আবীর যেন কতই অবাক হয়েছে, চোখ বড় করে বিস্ময়ের গলায় বলল “তার মানে?”

“মানে আর কী! জানি না বলে জিজ্ঞেস করছি।” পরমা হাসি চেপে আবীরের কাছাকাছি বসল।

আবীর বলল, “তোমায় একদিন আমার স্কুল-কলেজের বোগাস্ কাগজগুলো দেখাতে হবে। আমায় তুমি একেবারেই মূর্খটুর্খ ভাবছ। মোস্ট্ ইন্‌সাল্‌টিং…”

পরমা হাসল না, ঠোঁট পুরু করে বলল, “কাগজ দেখিয়ে কী হবে!…যাক্ গে, কথাটা তুমি যা বললে তা নয়, ওটা হল : লতায় কণ্টক আছে, কুসুমে কীট, গন্ধে বিষ—এইরকম আর কী!”

আবীর সহর্ষে দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলল, “বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস বলেছ। তুমি একেবারে মা সরস্বতী। এই না হলে বিদ্বান্ লোকের বউ হয়! আরে ব্বাস, আমি কোথায় মুখ খুলতে এসেছি, প্রফেসারের বউয়ের কাছে…। আমি জেনুইন্ গাধা।”

পরমা হেসে ফেলল। তারপর বলল, “আজকাল প্রায়ই তুমি ওকথাটা বলো কেন?”

“কী?”

“প্রফেসারের বউ।”

“আমি কী করে জানব! তোমার কাছে শুনেছি বলে বলি।

এতে অন্যায় কী?"

"তুমি আমায় ঠাট্টা কর।...আমি কিন্তু অন্য কোনোভাবে কথাটা বলি নি, শুধু নিজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম, পরিচয় দেওয়ার জন্যে..."

আবীর কয়েক পলক পরমার মুখ দেখল, তারপর বলল, "বেশ, আর বলব না। কিন্তু তুমি আমায় বললে না, কীভাবে উনি মারা গেলেন!"

পরমা নীরব থাকল অনেকক্ষণ, পরে বলল, "বলব একদিন; শুনতেই পাবে।"

"আজই শুনি।"

"না।"

"না কেন? তোমার আপত্তি কোথায়?"

পরমা কোনো জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে আবীর বলল, "আমি বুঝতেই পারি না—তুমি ব্যাপারটা এত সিক্রেট্ করে রাখছ কেন! আমায় বললে ক্ষতি হয়!"

"ক্ষতির কথা আমি বলি নি," পরমা বলল, "আমার ইচ্ছে করে না।"

"কেন?"

"সব কেনর জবাব আমি দিতে পারি না। আর তোমারই বা আমার স্বামী সম্পর্কে এত খোঁচানো কেন। মেয়েদের স্বামীর কথা বলতে নেই।" পরমা শেষের দিকে কথাগুলো লঘু করে দিল।

আবীর পরমার জীবনের কথা অল্পে-অল্পে কিছু জেনেছে, কিন্তু আশ্চর্য—পরমা আজ পর্যন্ত তার স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে সবিস্তারে কিছু বলে না। শুধু বলে—একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে তিনি মারা যান। এই গণ্ডগোলটা কিসের, কোন্ ধরনের, কীভাবে পরমার স্বামী তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে মারা গেলেন—আবীর বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, এমন কিছু হয়ত আছে যা পরমা গোপন রাখতে চায়। তবু, আবীরের ধারণা, ব্যাপারটাকে এত রহস্যময়

করে রাখারও কোনো কারণ নেই।

স্বামীর প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যেই যেন পরমা এবার অন্য কথা তুলল। বলল, "তুমি যে আমায় বলেছিলে বকুলতলার দিকে আলাদা একটা বাড়ি খুঁজে দেবে, কী হল ?"

আবীর পরমার চোখের দিকে তাকাল। এই বাড়িতে পরমার ঠিক কী ধরনের অসুবিধে হচ্ছে সে স্পষ্ট বলে না। আবীর সন্দেহ করছে, এ বাড়ির আরও দু-তিন ঘর ভাড়াটেকে পরমার পছন্দ নয়। হয়ত আবীরের এই আসা-যাওয়া তাদের কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে।

আবীর বলল, "খুঁজছি, পাচ্ছি না।···সবে বাড়ি হতে শুরু হয়েছে ওদিকে, দু-চারটে তৈরী হয়ে যাক, তখন দেদার বাড়ি পাওয়া যাবে।" বলে আবীর একটু থামল, পরে কী মনে করে হেসে বলল, "আমার মা ওখানে একটা জমি কিনে রেখেছিল আগে, সস্তায়। বলছে, বাড়ি করবে। তোমায় দিয়ে দেব।" বলে আবীর হাসল।

"তাই দিও।" পরমা ঠাট্টার মুখ করে হাসল।

আবীর বলল, "তুমি একটা বাড়িফাড়ি কিনে ফেল না ওখানে।"

"আমি বাড়ি কিনব! আমার টাকা কই ?"

"তোমার টাকা নেই ?···এটা যে দিলে, একেবারে ক্লীন ওয়াশ— ! সেদিন তোমার জন্যে আমায় ব্যাঙ্কে গিয়ে লাইন মারতে হয়েছিল যে দিদিমণি! গল্প মারছ কেন ?" আবীর এমন মজার গলা করে দিদিমণি বলল যে পরমা হেসে ফেলল।

পরমা বলল, "লাইফ্ ইনসিওরের আর ওঁর কলেজের কিছু টাকা পেয়েছি—সে আর কতটুকু! টাকা থাকলে কেউ শখ করে চাকরি করে!"

"টাকা না থাকলেও করে না। যেমন আমি···"

"সত্যি, তুমি অদ্ভুত।"

"অদ্ভুত কেন ?"

"কী করে তুমি এইভাবে বসে থাক ? নেহাত মা রয়েছে মাথার ওপর।"

আবীর পরমার চোখের দিকে সহাস্য চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "সবাই তাই বলে। ওটা অ্যাকসেপ্টেড্! কিন্তু দু'বেলা ফ্রি খাওয়া আর একেবারে বেকায়দায় পড়লে মার কাছ থেকে দু-পাঁচটা টাকা নেওয়া ছাড়া আমি মাকে এক্সপ্লয়েট করি না।"

পরমা হাসি মুখে রাগ মিশিয়ে বলল, "তোমার এমনি-এমনিই চলছে?"

"না, এমনি-এমনি চলবে কেন! দশ-বিশ টাকা আরও লাগে। সেটা আমি এদিক-ওদিক থেকে রোজগার করে নিই।" আবীর বেশ সরল গলায় বলল।

পরমা সামনের দিকে ঝুঁকে বসল একটু, বেতের চেয়ারের ওপর কনুই রেখে চিবুকের তলায় হাত রাখল। বলল, "এই করেই তোমার চলবে?"

আবীর বসে-বসে পা নাচাল, বুড়ো আঙুলটার জ্বালা কমাতে আরও একবার ঠোঁটের কাছে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে জিভ ছোঁয়াল। পরমার দিকে মজার চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে শেষে বলল, "আমার নিজের একটা ফিলজফি আছে, বুঝলে!" ফিলজফি শব্দটা সে এমন মজা করে উচ্চারণ করল যে পরমা জোরেই হেসে ফেলল।

পরমা শুধলো, "কেমন ফিলজফি, শুনি!"

"অনেকবার বলেছি। আরও স্ট্রেট করে বলব?"

"বলো।"

আবীর ডান হাতটা শূন্যে তুলল, তর্জনী নাচাল। বলল, "এ-জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি। আমি না বাবা, খোদ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।...আমার কথা হল, সুখেশান্তিতে থাকতে হলে মানুষের চাই-চাই ভাব কমাতে হবে, মানে যত কমে চালানো যায় চালাতে হবে, আমার মতন। যেমন আমার শোবার বিছানা মামুলী, জামা কাপড় পাজামা—ছেঁড়া এবং আস্ত মিলিয়ে অল্ টোটাল্ বারোখানাও হবে না, জুতো দু'জোড়া, তার মধ্যে এক

জোড়া ছেঁড়া চটি। সস্তা সিগারেট খাই, চা খাই বন্ধুদের সঙ্গে, ওরাই পেমেণ্ট করে দেয়। তোমার এখানে ফ্রি-তে ওমলেট-টোমলেট হয়। হপ্তায় দু' দিন দাড়ি কামাই, মাথায় তেলফেল বড় মাখি না। আবার কী—সিম্পল্ লাইফ।"

পরমা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। তার গলা বা হাত এমন কি মাথার চুলও এখন দেখা যায়। মোলায়েম গলা, হাত মসৃণ এবং পুষ্ট, মাথার মোটা এলো খোঁপা ঘাড়ের তলায় পড়ে আছে। খুব হালকা কমলা রঙের শাড়ি পরনে পরমার, পাতলা মেয়েলী শাল বুকের কাছে আলগোছে জড়ানো।

হাসতে-হাসতে পরমা বলল, "বাঃ, বেশ সিম্পল্ লাইফ!"

আবীর বলল, "তুমি হাসছ?"

"না, এবার কাঁদব ভাবছি।"

আবীর পরমাকে দেখতে-দেখতে বলল, "নাঃ, তুমি এসব বুঝবে না। তোমার মতন শৌখিন, ছিমছাম, ব্যাংকে টাকাওয়ালা মেয়ে এসব বুঝবে না।"

পরমা যেন এবার শাড়ির আঁচল মুখে রেখে বাড়তি হাসিটা চাপা দিল।

আবীর চুপচাপ থাকল সামান্য, তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। বড় বড় করে ধোঁয়া টানল, ঢোঁক গিলল। তার মুখের ভাব ক্রমশ অন্যরকম হয়ে আসছিল।

আবীর বলল, "আমি তোমার সঙ্গে সবটাই কিন্তু ইয়াকি মারছি না। সিরিয়াসলি বলছি।"

"কী সিরিয়াসলি বলছ?"

"আমার সত্যি-সত্যিই ধারণা—আমরা নিজেদের সুখ, আরাম, সচ্ছলতা প্রয়োজনের বেশি চাই। চাই না?"

"কেউ কেউ চাইতে পারে।"

"বেশির ভাগই চায়। তবে তুমি বলতে পার, আমাদের দেশের বেশির ভাগই লাঙ্গা ফকির টাইপের, ভিখিরি। আমি এদের কথা

বলছি না, কিংবা এদের জন্যেই বলছি, আমাদের মতন বাবু লোকের সুখ আরাম সচ্ছলতা খানিকটা কম হলে ক্ষতি নেই।"

পরমা অবাক-চোখে আবীরকে দেখছিল। ঠাট্টা করে বলল, "তুমি কোন্ দলে?"

"কোনো দলের নই।··দলফল আমি হেট করি। ওসব হল বোগাস। আমার দল নেই, আমি একলা। একলা চলো পার্টি।··· না না, সত্যিই তুমি ভেবে দেখো, আমাদের মাথায় সব সময় নিজের জন্যে কিছু করার ফিকির রয়েছে। নানা রকম আশা, লোভ, ফন্দি, বাসনা, আরও কত কী! এই থেকেই যত গণ্ডগোল।"

"তোমার কী আছে?"

"কুছ নেহি।" আবীর হাসল। "কিছু না। আমার কোনো পার্সোন্যাল অ্যামবিশান্ও নেই। পার্সোন্যাল অ্যামবিশান্ মানুষকে করাপ্ট করে—তুমি দেখো ভিখিরিরা ছিঁচকে চোরটোর বড় জোর হতে পারে—কিন্তু পাপী হয় না। আমরা হই···আমি তাই কোনোরকম নিজস্ব চাহিদা, অ্যামবিশান্ রাখিনি। একেবারে বাবাজী হয়ে আছি।" আবীর হাসতে-হাসতে বলল, কিন্তু এ হাসি অর্থহীন নয়।

পরমা কিছু বলল না।

৬

বারান্দার রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবীর খাচ্ছিল, পাশে বিজনবালা। ঠকঠকে শীত পড়েছে। ভীষণ শীতকে বিজনবালা বলেন, 'ঠকঠকে শীত', কখনও বলেন 'চামড়াকাটা শীত'। এ দুটো কথা যে তিনি কোথা থেকে শিখেছিলেন নিজেও জানেন না। আবীরের পাশে, একটু কোনাকুনি হয়ে বসে বিজনবালাও ভাত খাচ্ছিলেন। খেতে-খেতে ছেলে এবং মায়ে নানারকম কথা হচ্ছিল। বিজনবালা এখন বাড়ি-বাড়ি করে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। জমানো পুঁজি যা আছে তাতে কুলিয়ে উঠবেন এমন নয়—তবু বাড়িটা শুরু করে দিলে চেয়েচিন্তেও হয়ত আশ্রয়টা শেষ করে ফেলা যাবে। বাড়ির নকশা তৈরি, মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে আসা-যাওয়া চলছিল। বিজনের দুঃখ, এ সমস্ত কাজে তিনি ছেলের সাহায্য মোটেই পান না। একটা কথা বলতে-বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যাবার যোগাড় হলে তবে হয়ত আবীর কিছু করে।

খেতে-খেতে এই ধরনের কোনো ব্যাপারে অনুযোগ করছিলেন বিজন, পরে দেখলেন—আবীরের তাতে কান নেই। অন্য কথা শুরু করলেন।

পরে আচমকা বললেন, "হ্যাঁ রে, পশুপতি উকিলের বাড়িতে যে মেয়েটি এসেছে তার সঙ্গে কাল কোথায় যাচ্ছিলি?" বলে বিজন ছেলের দিকে তাকালেন।

"কবে?" আবীর মার মুখের দিকে তাকাল না।

"কাল।"

"তোমায় কে বলল?" আবীর এবার ঘাড় ফিরিয়ে বিজনের চোখের দিকে তাকাল।

"সুষমা।"

"পার্কে যাচ্ছিলাম।"

"সে এখানে কোথায়, অনেক দূর তো।"

"দূরেই যাচ্ছিলাম।"

বিজনবালা ছেলের মুখ দেখতে-দেখতে বললেন, "কতটা হয়েছে পার্কের? শুনছিলাম বাতিটাতি বসাচ্ছে, রাস্তা তৈরি করছে—"

আবীর বলল, "প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন গিয়ে দেখে এস। জব্বর করেছে।"

এই শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে, নদীর গা বরাবর একটা পার্ক হচ্ছিল আজ বছর দুই ধরে। সেই পার্ক এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন থেকেই লোকজন দেখতে বেড়াতে যায়। আবীররা গিয়েছিল সন্ধ্যের দিকে। সবে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে কয়েকটা। দেখতে গিয়েছিল।

বিজন এবার বললেন, "ওই মেয়েটি কে? শুনেছি চাকরি করে।"

"পরমা।"

"প-র-মা! নাম পরমা?"

"হ্যাঁ; বিজনবালা নয়—।" আবীর গম্ভীর মুখে বলল।

বিজনবালা হেসেই ফেললেন। "আমাদের সময় পুরোনো নাম ছিল; তোদের সময় নতুন নতুন নাম। তা যাক্, মেয়েটি কে?"

"কে আবার! একটা মেয়ে···"

"ফাজলামি করিস না। ও একলাই থাকে শুনেছি···"

"তা কী করবে, স্বামীটামী নেই, মারা গেছে।"

বিজনবালা লোকমুখে এই রকমই শুনেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, "আহা, এই বয়সে বিধবা! বেচারী! দেখে তো তোর চেয়ে তেমন কিছু বড় মনে হয় না।"

"আমার চেয়ে বড় নয়। আমার বয়সী!"

"কী বলিস তোর চেয়ে বড় বইকি।"

"তুমি কি ওরও নাড়ি কেটেছ?" আবীর মার চোখের দিকে সকৌতুকে তাকাল।

বিজন কেমন মুশকিলে পড়ে চুপ করে গেলেন।

আবীর বলল, "পরমা আমার বয়সী। মেয়েরা ভারিক্কি চালে থাকলে খানিকটা বড় বড় দেখায়। নইলে ওরও চব্বিশ-পঁচিশ।"

বিজন যেন ছেলের কাছে সরাসরি হেরে গিয়ে এবার অন্য দিক থেকে খোঁচা মারলেন, "পরমা পরমা করছিস কী! ও তোর ইয়ারবন্ধু নাকি? ওর সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক?"

আবীর মার চোখ-মুখের সবটুকু কৌতূহল পড়তে পারল। এটা সে পারে। হাসিটা চেপে রেখে ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলা ও মুখ করে বলল, "পরমা আমার ফ্রেণ্ড। ওর সঙ্গে আমার ফ্রেণ্ডশিপ্ হয়েছে খুব—।"

বিজন একেবারে বোকা হয়ে গিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আবীর তাঁর মুখের শব্দটাও যেন কেড়ে নিয়েছে। সামান্য পরে বললেন, "তারপর—?" বলে জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

আবীর বলল, "তারপর—! তারপর আবার কী?"

"এত যে মেলামেশা করছিস, এরপর কী হবে?"

আবীর মার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে এবার যেন জোর করে হেসে ফেলল, বলল, "এরপর কী হবে বলা মুশকিল। ভেরী ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, মা।…কিছুই হয়ত হবে না।"

বিজনবালা ছেলের হাসি এবং মুখের অনিশ্চিত, সামান্য বা চাপা লাজুক ভাব, চোখের অন্যমনস্কতা লক্ষ করলেন। কিছু বললেন না।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল।

আবীর যখন উঠে পড়ছে, বিজনবালা বললেন, "অত বন্ধু যে সে তো একদিন এ বাড়ি আসতে পারে।"

আবীর কিছু বলল না।

দুপুরে আবীর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলে গায়ের লেপ গলার কাছে টেনে পাশ ফিরতে-ফিরতে পলকের জন্যে মনে হল, এখন বোধহয় মাঝ রাত ; তারপর ভাঙা ঘুম জুড়ে নেবার জন্যে আচ্ছন্নের মতন সামান্য সময় শুয়ে থাকতে-থাকতে সে বুঝতে পারল, এখন বিকেল, দুপুর শেষ হয়ে গেছে। মার সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। মা আবার তার ডাক্তারখানায় চলে গেছে, ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যে। বাড়ির মধ্যে মকরদি কাজকর্ম সারছে, সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

আবীর শুয়ে থাকল। শুয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে পড়ল : কিছু আগে ঘুমের মধ্যে সে একটা অদ্ভুত লোকের স্বপ্ন দেখছিল। লোকটা পরমার স্বামীই হবে। কেননা আবীর দেখছিল, লোকটা পরমার বাড়িতে ঘরের মধ্যে বসে আছে। বসে বসে একটা বন্দুক পরিষ্কার করছে। লোকটার মাথা সামান্য নামানো, জোড়া বন্দুকের নল দেখছে। ওর মাথার চারদিকে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, গালে প্লাস্টার আঁটা। আবীর এ-রকম একটা লোককে পরমার ঘরে দেখে রীতি মত অবাক হয়ে যখন কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে, দেখল, পরমা এসে লোকটার হাত থেকে বন্দুক সরিয়ে কোলের ওপর বসে পড়ল। বন্দুকটা যেন নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠে আবীরের দিকে নলের মুখ করে শূন্যে ঝুলতে লাগল। আবীর তাড়াতাড়ি দরজার পাশে সরে গেল।

এরপর আর কিছু মনে পড়ল না আবীরের। লোকটার ব্যাপার-স্যাপার এবং বন্দুকের লাফ মারা তাকে বড়ই অবাক করে দিয়েছিল। ও যে পরমার স্বামী তাই বা কী করে হল, আবীর বুঝতে পারল না। পরমার ঘরে ছিল বলে ? নাকি পরমা ওর কোলে এসে বসল বলে ? কিংবা লোকটার ফাটা মাথায় ব্যাণ্ডেজ এবং গালের এক পাশে প্লাস্টার আঁটা ছিল বলে ?

স্বপ্নটা অদ্ভুত এবং মজার। এ-রকম স্বপ্ন দেখার কারণও আবীর ঠিক বুঝতে পারল না। পরমার স্বামী কি আবীরকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে চায় ? যা বাব্বা ! তাহলে তো লোকটাকে আবার

জন্মাতে হয়। না, সেরকম কিছু নয়। বরং এ থেকে মনে হতে পারে, আবীরের ব্যাপারটা ভাল দাঁড়াচ্ছে না—এটাই যেন বলা হচ্ছে। বেশ, তা নয় হল, কিন্তু আবীর পরমার স্বামীকে জীবনে দেখেনি। স্বপ্নে তাকে কী করে দেখল? লোকটা পরমার স্বামীই বা হয়ে গেল কেমন করে? মজা মন্দ নয়।

আবীরের হাসিই পাচ্ছিল একরকম, কিন্তু সে পরিষ্কার মনে হাসতে বা মজা অনুভব করতে পারছিল না। কী যেন, কিছু যেন—আবীর বুঝতে পারছিল না—তার মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। মাথা ভার হয়ে আসছে বা ভুরুর তলায় কোথাও ব্যথা উঠছে মনে হলে যেরকম লাগে আবীরের সেই রকম লাগছিল। শুয়ে থাকল আবীর। শুয়ে থাকতে থাকতে আচমকা তার কানে এল একেবারে কাছাকাছি কোথাও কোনো ধুনুরি তুলো ধুনছে, ধুন্ ধুন্···ধুন্ শব্দটা ভেসে আসছে। শেষ বেলায়, হয়ত কাজ শেষ হয়ে আসায় ধুনুরি ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তার হাত আর তেমন নড়ছে না, শব্দটাও তাই দীর্ঘ, মৃদু এবং প্রায় ফুরিয়ে আসার মতন হয়েছে। আবীর অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল।

এ-রকম অন্যমনস্কতার মধ্যে স্বপ্নের ছবিটাও টুকরো টুকরোভাবে আসছে। কেন আসছে কে জানে! আবীর একসময় দেখল, হাউই বাজির ফুলকির মতন একটা দুটো কি তিনটে টুকরো যেন আকাশ থেকে নেমে আসতে-আসতে ছাই হয়ে গেল।

পরমার বাড়িতে আসতে আসতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। শীত বেড়েছে, হিম পড়ছিল বাইরে। আবীর এখানে আসার আগে শঙ্কুদের কাছে গিয়েছিল। তাস খেলেনি। ইচ্ছে ছিল না, টাকা পয়সাও ছিল না পকেটে। শঙ্কুদের আড্ডায় বসে সামান্য খেয়েছে, রাম-টাম খেতে তার ভাল লাগে না, তবু খেয়েছে। দত্তকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও করেছে সামান্য। তারপর উঠে এসেছে। শঙ্কুদের আড্ডা থেকে সোজাসুজি সে পরমার বাড়ি আসেনি। অকারণে

খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে শেষে চলে এসেছে।

পরমা উল বোনার কাঁটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসেছিল। উলের গোলা কোলের ওপর।

আবীর পরমার কোলের ওপর উলের গোলাটা দেখল কয়েক পলক। তারপর বলল "আজ দুপুরে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।"

পরমা ঘর বোনার হিসেব ভুল হয়ে যাবে বলে চোখ তুলে তাকাল না। হাতের কাজটুকু শেষ করতে লাগল।

আবীর বলল, "একটা লোককে দেখলাম। লাইফে তার মুখ আমি দেখিনি। ফাটা মাথা ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো। এক গালে প্লাস্টার-সাঁটা।"

পরমা এবার চোখ তুলল।

"লোকটা তোমার ঘরে—এই ঘরে বসে-বসে বন্দুক পরিষ্কার করছে," আবীর বলল, বলে অপেক্ষা করবার সময় পরমার চোখ মুখ লক্ষ করছিল। "লোকটা তোমার স্বামী।"

খুব অবাক হয়ে যাওয়ায় পরমার চোখের পাতা ছড়িয়ে পড়ল। মণি স্থির। ঠোঁট ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দেখা যাচ্ছিল তার, নিঃশ্বাস নেবার পর পরমা বলল, "আমার স্বামী!"

আবীর বলল, "তোমারই স্বামী। আমার সেই রকম মনে হল। এই ঘরে লোকটা বসে। বন্দুক পরিষ্কার করছে। তুমি এসে বন্দুকটা পাশে সরিয়ে দিয়ে বসে পড়লে—" বলতে-বলতে আবীর ভাবল, তুমি তার কোলে এসে বসলে বলা উচিত ছিল কি?

পরমা একই ভাবে তাকিয়ে থাকল।

"সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল—" আবীর হেসে বলল, "তোমার সরিয়ে-রাখা বন্দুকটা দেখি হঠাৎ নিজের থেকে লাফ মেরে আমার দিকে স্ট্রেট নল তাক্ করে ঝুলছে! এই একটা গুলি চলল ভাব। আমি সট্ করে দরজার পাশে সরে গেলাম।"

পরমা যেন আবীরের দেখা স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে একটা ছবি

গড়ে নেবার চেষ্টা করল। দেখতে চাইল ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়। বলল, "লোকটা আমার স্বামী হবে কেন?"

"কী জানি! আমার মনে হল তোমার স্বামী। তোমার এই ঘরে লোকটা বসে, তার মাথা ফাটা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; তার ওপর তুমি এসে এমনভাবে তার কাছে বসলে।—একেবারে গায়ের ওপর······"

পরমা এবার বাধা দিয়ে বলল, "দুপুরে কি গাঁজা-চরস খেয়েছিলে?"

"কোথায় আর খেলাম।" আবীর হাসল "কিন্তু ব্যাপারটা কী? আমার দিকে বন্দুকের নল কেন? মেরে ফেলতে চাও?"

পরমা উলটুল নামিয়ে পাশে রেখে দিল। অপ্রসন্ন গলায় বলল, "তুমি কি আসবার আগে মনে-মনে একটা গল্প তৈরী করে এনেছ?"

"না না, নেভার। মাইরি বলছি স্বপ্নটা আমি দেখেছি।"

পরমা কপাল কুঁচকে বিরক্তির ভাব করল। "তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু নেই।"

আবীর বলল, "স্বপ্নের মুণ্ডু থাকে না!······আমার ভাবনা কিন্তু আলাদা, তোমার ডেড্ হাজব্যাণ্ড্ কিন্তু আমার ওপর ফায়ার হয়ে যাচ্ছে। পেলে গুলি মেরে উড়িয়ে দেবে।" আবীর যদিও ঠাট্টা তামাশার গলায় কথাগুলো বলছিল, তবু বুঝতে পারছিল, সে অন্য রকম কিছু মনে করছে।

পরমা চোখ বুজল, দু হাতের আঙুল চোখের পাতার ওপর টিপে ধরে হাত সরিয়ে নিল, চোখ খুলল। যেন বোনার কাজ করতে করতে তার চোখ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বা এমনও হতে পারে, সে ওই মুহূর্তে স্বামীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল।

আবীর এবার সিগারেট ধরাল। না, আজ সে পরমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেবে না, বলবে—তোমার স্বামীর কথা বলো। তার ফটো দেখাও। আমি দেখতে চাই লোকটা কেমন। তার মুখ

দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমার অস্বস্তি যাবে না। যতক্ষণ না তোমার মুখ থেকে কিছু শুনছি আমার খারাপ লাগবে। খারাপ লাগবে এই জন্যে যে, যার কথা আমি কিছুই জানি না (মাত্র ওইটুকু শুনেছি, সে গণ্ডগোলে পড়ে মারা গেছে), যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি—তার হাতের বন্দুক আমার দিকে উঠে আসবে কেন? আমি তার কী ধরনের শত্রু? তার বউয়ের সঙ্গে আমার ভাব, মেলামেশা তার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু যদি সে বেঁচে থাকত, তবেই। সে মারা গেছে। তার এখন কোনো কিছুই করার নেই। এমনও হতে পারে, আবীর মনে-মনে ভাবনার গলায় বলল: আমি নিজেই তোমার স্বামীকে খাড়া করছি, আমারই দ্বিধার জন্যে! নীতিটীতি সংস্কার—এ-সব মানুষকে টানে, বোঝা যায় না। আমি কি এখন সেই দোটানায় পড়েছি? জানি না। আসলে, তোমার স্বামীর কথা জানার জন্যে আমার কৌতূহল ভীষণ; সে কেমন ছিল, তার কী হয়েছিল, তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল—আমায় বলো। আমি শুনতে চাই।

জোরে-জোরে প্রায় আধখানার মতন সিগারেট খেয়ে আবীর বলল, "তোমার স্বামী কী রকম দেখতে ছিল?"

পরমা কোনাকুনি চোখে চেয়ে থাকল আবীরের দিকে। "কেন?"

"আমি দেখতে চাই। স্বপ্নের লোকটার মতন কিনা?"

"না।" পরমা মাথা নাড়ল।

"না।······তুমি বুঝলে কী করে?"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"আমার স্বপ্নের লোকটার মুখ আমি দেখতেই পাইনি একরকম। সে বন্দুকের নিশানায় চোখ দিয়ে ছিল, তার মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল বন্দুকে। মাথায় ব্যাণ্ডেজের পাগড়ি। পিকিউলিয়ার দেখাচ্ছিল। মুখটা আমার আবছাভাবে মনে ছিল তখন, এখন ভুলে যাচ্ছি।"

পরমা অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। "মুখটা তোমার মনগড়া।"

আবীর অধৈর্য হয়ে উঠছিল। "তোমার স্বামীর ফটো নেই?"

"আছে একটা।"

"এ ঘরে নেই; ও ঘরেও নয়—"বলে আবীর এ-ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ফটোটার দিকে তাকাল। পরমার বাবার ফটো, বুড়ো ধরনের, পরমার সঙ্গে মুখের মিল বড় নেই। আবীর যতবার ফটোটা দেখেছে ততবার তার মনে হয়েছে, পরমার বাবা গুরুগম্ভীর লোক ছিলেন। অবশ্য তিনি তা ছিলেন না। "ও ঘরেও আমি তোমার স্বামীর ফটো দেখিনি।"

"না," পরমা ইতস্তত করল, "ও ঘরেও আমি রাখি নি।"

"কিন্তু লোকে রাখে······আমার মার ঘরে এখনও বাবার ছবি ঝোলে।"

পরমা ঘাড় সামান্য নিচু করে একপাশে সরিয়ে নিয়ে কিছু ভাবল। "আমার চোখের সামনে আমি তার ছবি টাঙিয়ে রাখতে চাই না। কী হয়েছে তাতে?"

"কিছু হয়নি।···আমায় তুমি ফটোটা দেখাও।"

"আঃ, আবীর, তুমি কী খ্যাপামো করছ! এখন কে বাক্স হাতড়াতে বসবে? কী হবে তোমার দেখে?"

"তুমি আমায় দেখাবে না?"

"দেখাব না বলিনি। এখন নয়। পরে দেখাব। আমি নিজেই একদিন তোমায় দেখাতাম।" পরমা আবার আবীরের চোখের দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বলছিল—আমায় এখনকার মতন দয়া করে মাপ করো।

আবীরের ভাল লাগছিল না। পরমা অনেকদিন ধরে তার স্বামীকে নিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলছে। কেন? কী এমন থাকতে পারে তার স্বামীর ব্যাপারে। আবীর বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অযথা মিস্ট্রি তৈরী করছ। অনেকেরই স্বামী মারা যায়, তোমার মতন কেউ করে না।"

আবীর যে ক্রমশই অসন্তুষ্ট, ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠছে পরমা তা বুঝতে

পারল। আজকাল প্রায়ই এই প্রশ্নটা এসে দাঁড়ায়। পরমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, আবীর কোথাও কোনো দ্বিধা বা অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। আজকের স্বপ্ন—সেটা যেমনই হোক, আবীরকে শুধু অবাক করে নি, বিশ্রী কোনো অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে।

তবু পরমা ব্যাপারটা এড়াতে চাইল। বলল, "আমার স্বামী নিয়ে তোমার এত ভাবনা কেন!"

আবীর এই ধরনের কথা বুঝল না। বলল, "বাঃ! এ তো অদ্ভুত কথা।"

"কেন, অদ্ভুত কেন?"

"তোমার স্বামীর কথা আমি জানতে চাইতে পারি না!"

"জেনে তোমার কটা হাত গজাবে!"

"হাত পা গজাবার কথা নয়—" আবীর অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বলল, "হয় তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না; না হয়—" আবীর থামল।

"না হয়, কী?"

"না হয় তোমার স্বামীর ব্যাপারটা গল্প।"

পরমা যেন আবীরের ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা অনুভব করতে পারল। ভাবল সামান্য, বলল, "আমার স্বামী কেমন দেখতে ছিল তুমি শুনতে চাও?"

"চাই। শুনতে চাই, দেখতে চাই।"

পরমা কয়েক মুহূর্ত আবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা বলল, "আমার স্বামী অনেকটা তোমার মতন দেখতে ছিল।"

আবীর বিশ্বাস করল না। পরমা তার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা করছে। এই ঠাট্টা তার ভাল লাগছিল না। রাগ হচ্ছিল। বাজে ঠাট্টার কোনো মানে হয় না। বেশ, তুমি তোমার স্বামীকে বাক্স-সুটকেসে লুকিয়ে রাখো, কিপ্ ইট্ সিকরেট্, আমি আর কিছু বলব না।"

পরমা আবীরের অবিশ্বাস দেখে অবাক হল না, রাগও করল না। বলল, "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না।" আবীর মাথা নাড়ল। "বিশ্বাস করার কথা এটা নয়।"

নিবিড় চোখে পরমা আবীরকে দেখল। মৃদু স্বরে বলল, "সত্যি তোমার মতনই দেখতে ছিল।"

পরমার চোখের দিকে তাকিয়ে আবীর এবার পুরোপুরি যেন কথাটা অগ্রাহ্য করতে পারল না। "আমার মতন মানে ?"

"তোমারই মতন অনেকটা," পরমা ধীরে-ধীরে বলল, "মুখের আদলে খুব মিল আছে দুজনের। আমি যেদিন এখানে রাস্তায় তোমায় প্রথম দেখি খুব চমকে গিয়েছিলাম। তোমায় আমি দেখেছিলাম একদিন সন্ধ্যেবেলায়, তুমি চায়ের দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলে, বৃষ্টি এসে পড়েছিল তখন।" পরমার চোখ যেন সেদিনের সন্ধ্যা এবং বৃষ্টির মধ্যে আবীরকে দেখতে-দেখতে উদাস হয়ে গেছে। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। তোমায় দেখে এত চমকে গিয়েছিলাম যে, আমি ডেকেই উঠেছিলাম। বৃষ্টির ছাটের শব্দে আর মেঘের ডাকে ভাগ্যিস আমার গলা শোনা যায়নি।"

আবীর এবার কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। পরমাকে দেখছিল, পাতা পড়ছিল না চোখের। পরমাকে অবিশ্বাস করা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না, অথচ এ যে কী করে সম্ভব সে বুঝতে পারছে না।

পরমা তার বাঁ হাত কপালে রাখল খানিক, চোখ বুজে থাকল। পরে হাত সরিয়ে চোখ খুলে বলল, "সেদিন সারারাত আমার কী করে কেটেছে আমিই জানি শুধু। যে নেই—তাকে আমি দেখেছি এরকম বিশ্বাস করে নেব তত ছেলেমানুষ আমি নই। কিন্তু মানুষের এমনই মন—সব জেনে বুঝে, দেখেশুনেও কত রকম ভাবে। আমিও ভেবেছি, এই বুঝি সে এসে দরজায় কড়া নাড়বে।...আমার ভয়ও করছিল, ছমছম করছিল গা ; মনকে বোঝাচ্ছিলাম—" পরমা কথা বলতে-বলতে থেমে গেল।

আবীর যেন শেষ পর্যন্ত খানিকটা স্বীকার করে নিতে পেরেছে, বলল, "আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যই।···পরের দিন আমি আবার তোমায় দেখেছি ভাল করে।"

"আমি বুঝতে পারি নি।"

"তোমার বোঝার কথা নয়। তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুচির কাছে চটিজুতো সারাচ্ছিলে, আমি রিকশা স্ট্যাণ্ডে গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলাম, রিকশাওলাটা চাকার হাওয়া ঠিক করতে গিয়েছিল।"

"ব্যাপারটা কী করে হল আমি বুঝতে পারছি না," আবীর এবার যেন এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কার্যকারণ খোঁজার চেষ্টা করছে এমনভাবে বলল, "যমজ ভাইটাই হলে হয় শুনেছি, দেখেছিও। আমাদের এখানে স্টেশনে হালুইকর আছে গণেশ, তারা দু ভাই একই রকম দেখতে।"

পরমা বলল, "যমজ না হলেও হয়। কত সময় আমরা অচেনা মানুষকে চেনা লোক বলে ডেকে ফেলি।"

আবীর কথাটা স্বীকার করে মাথা নাড়ল সামান্য।

"আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার মুখের মিল খুব—" পরমা বলল, "কিন্তু একেবারে এক নয়। তোমার নাক আরও একটু উঁচু, কপাল বেশি চওড়া; তোমার চোখ আরও কালো। মাথায় বোধ হয় তুমি ওর চেয়ে লম্বা বেশি হবে সামান্য; গায়ের রঙ মোটমুটি একই রকমের—।"

আবীর অনেকক্ষণ পরে এবার যেন আড়ষ্টভাবে ঠাট্টাই করল সামান্য, "আমি কালো।"

"না, তুমি কালো নও, শ্যামলা। সেও শ্যামলা ছিল। তোমার মতন অত চুল ছিল না মাথায়।"

"আর কী-কী তফাত আছে?" আবীর হাসতে চাইল।

"আছে। অনেক আছে। তোমার মতন করে সে কথা বলত না, গলার স্বর তোমার অনেক সুন্দর। তুমি খানিকটা পাগল, সে পাগল ছিল না।"

আবীর বাধা দিয়ে কৌতুকের গলায় বলল, "আমি পাগল! কী বলছ তুমি?"

পরমা মলিন করে হাসল। "পাগল বইকি! তুমি যেভাবে কথা বল, যেসব কথা বলো তাতে তোমাকে হয় ছেলেমানুষ না হয় পাগল বলতে হয়।...তোমাদের স্বভাবে কোথাও কোন মিল নেই, একেবারে আলাদা।"

আবীর চুপ করে থাকল। পরমাও নীরব। আবীরের আরও অজস্র প্রশ্ন ছিল, কৌতূহলও হচ্ছিল নানা ধরনের, তবু এত প্রশ্ন ও আগ্রহের জন্যে সে অধৈর্য হচ্ছিল না। বরং সে পরমার স্বামীকে মনে-মনে যেন এঁকে নেবার চেষ্টা করছিল। স্বপ্নের লোকটার সঙ্গে এর মিল আছে কিনা তাও আবীর বুঝতে পারল না। কেননা লোকটাকে সে একেবারেই ভুলে গেছে, বন্দুকটা স্পষ্ট হয়ে মনে আছে।

"তুমি সত্যিই বলছ?" আবীর আবার শুধলো।

"মিথ্যে বলব কেন।"

"আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, মানে বিশ্বাস করতে পারছি না পুরোপুরি।"

"না করতে পার। তোমার খটকা লাগতে পারে। তবে চেহারায় এতটা মিল আমাকেও অবাক করেছিল।"

আবীর বলল, "তোমার স্বামী কী করে মারা গেলেন বলবে না?"

"আজ থাক," পরমা মাথা নেড়ে বলল, "আজ আর ভাল লাগছে না। পরে একদিন বলব। তুমি এত অধৈর্য হচ্ছ কেন? বলেছি, বলব; ঠিকই বলব একদিন।"

আবীর পরমার চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, "ফটোটাও দেখাবে।"

"দেখাব।" পরমা গায়ের শাল ঘন করে জড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগল।

৭

এরপর কয়েকটা দিন আবীরের ওই একই চিন্তা : পরমার স্বামীর সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল রয়েছে। এটা কেন হল, কী করে হল? হওয়া অসম্ভব নয় হয়ত, ঘটনাচক্রে হয়েছে। কিন্তু তাই বা কেন হল? আশ্চর্য! রাত্রে ঘুমোবার সময় পর্যন্ত ভাবনাটা একভাবে আছে; মনে হল, সকালে এই ভাবনা আর থাকবে না, অথচ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে, চিন্তাটা আবার এসে গেছে। এসে যাবার পর আবীর দেখেছে, এই ভাবনাটা ধোঁয়ার মতন ক্রমশই ছড়িয়ে যায়, স্থির নির্দিষ্ট কোনো গতিতে চলছে না। সময় অসময় নেই, যখন তখন সে দেখছে, আবীর পরমার মৃত স্বামী হয়ে যাচ্ছে, কিংবা সেই মৃত ভদ্রলোক আবীর হয়ে উঠছে। সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত, হয়ত অর্থহীন। তবু এই চিন্তা থেকে যাচ্ছে, মাথার ভেতরে কোনো স্নায়ুর বেদনার মতন—কখনও চাপা কখনও তীব্র। আর ক্রমশ আবীর এই এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিজেকে প্রায় সমর্পণ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। পরমার স্বামীর চেহারার সঙ্গে তার চেহারার সাদৃশ্য থাকতে পারে, এটা স্বীকার করে নেবার পর আবীর সেই অজ্ঞাত অদৃষ্ট ব্যক্তিটির কথা ভাবতে গেলে নিজেকে কখন তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ফেলছে বুঝতে পারছে না। আবার তার এখন প্রায়ই মনে হচ্ছে, পরমার মতন মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার হয়ত এই একটি কারণই রয়েছে—; তার স্বামীর চেহারার সঙ্গে আবীরের সাদৃশ্য থাকায় কোনো দুর্বলতাবশত পরমা তাকে গ্রহণ করেছে। নয়ত এটা সম্ভব ছিল না। মনে হয়, পরমা অনেকদিন থেকেই আবীরকে গোপনে লক্ষ করছিল, এবং কোনো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—যে-সুযোগ পরস্পরকে কাছাকাছি করবে। কে বলতে পারে, সেদিন—ঘুসকি

কোলিয়ারী থেকে ফেরার সময়—আবীর যখন বিদ্যুৎদার গাড়িটা পরমার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন পরমা ঘটনাক্রমে সে-সুযোগ পেয়ে গেল না? আবীর নিজের তরফ থেকেই এই সুযোগটা পাওয়ার কথা ভেবেছে এতদিন। এখন সন্দেহ হচ্ছে, পরমাই সুযোগটা নিয়েছে। নয়ত, আরও একটু ভাবলে মনে হবে, পরমা মাত্র এইটুকু গাড়ি চড়ার জন্যে আবীরকে পরের দিনই আবার বাড়িতে আসার জন্যে বারবার বলবেই বা কেন? এটা ঠিক সাধারণ সৌজন্যের ব্যাপার নয়। পরমা চাইছিল, আবীর তার কাছে আসুক, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হোক। বোধ হয় পরমার মনে-মনে এই অভিলাষ ইচ্ছা বা আগ্রহ না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুজনের মধ্যে আজকের মতন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত না। পরমার স্বভাব থেকে সেটা আরও সন্দেহ হয়। যার কোনো ব্যাপারেই আগ্রহ নেই, যে একা, যে অন্য সব বিষয়ে উদাসীন, সে কেন আবীরের ব্যাপারে এতটা আগ্রহী উৎসুক হয়ে উঠবে? কেনই বা তার মন আবীরের দিকে ঝুঁকবে।

যখনই মনে হত, আবীর পরমার মৃত স্বামীর নকল বলে, কিংবা তার পরিপূরক বলে পরমার বন্ধু, প্রিয়জন কিংবা সঙ্গী হতে পেরেছে—তখন আবীরের খারাপ লাগত, রাগ হত। আবীর বুঝতে পারত, তার অহমিকায় লাগছে। এ-রকম হলে বাস্তবিকই পরমার কাছে আবীরের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই; পরমা তার স্বামীর স্মৃতি কিংবা সাহচর্যের বিকল্প হিসেবে আবীরকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু আবীর তা নয়। রাগ হলে আবীর মাথা গরম করে মনে-মনে বলত: 'আমি কারও ডুপ্লিকেট নই। আমি—আমি। তোমার স্বামীর খোলস পরে তোমায় সান্ত্বনা যোগাতে জন্মাইনি।' এই ধরনের ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কথাবার্তা নিজের মনে মনেই বলা যায়, পরমাকে বলা যায় না। অন্তত এখনও আবীর তা বলতে পারছে না। কারণ পরমা প্রসঙ্গটা আর উঠোতে চাইছে না। কোনো অছিলায় বা সরাসরি তা সরিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য আবীরও তেমন জোর করে কথাটা

তুলছে না। কেন তুলছে না সে জানে না।

এইভাবেই কয়েকটা দিন কাটল।

আবীর ভাবছিল, কথাটা ভূষণকে বলবে। এখন পর্যন্ত বন্ধুবান্ধব কাউকে কিছু বলেনি। বললে ওরা বলবে, পরমা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে রে। আরও অনেক কিছু বলবে—যেসব রসিকতা আবীরের জানা, এবং এক্ষেত্রে তার পছন্দ নয়। ভূষণকেই বলবে ভেবেছিল আবীর, কেননা ভূষণ মোটামুটি ভেবেচিন্তে কথা বলতে পারে। ত্রিদিব একেবারেই উজবুক। তাকে বললে সে কিছুই বুঝবে না, উপরন্তু খবরটা রটিয়ে বেড়াবে। বিভূতি বরাবরই দু নৌকোয় পা রেখে চলার মতন দু রকম কথা বলে, তার ধারণাটারনা স্পষ্ট করে জানা যায় না। সুরপতি আবার বেশি মাতব্বর। না, ভূষণকেই বলবে ভেবেছিল আবীর। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আবীর জিজ্ঞেস করবে, "তোর কী মনে হয় রে? পরমা আমাকে তার স্বামীর ডুপ্লিকেট হিসেবে নিয়েছে? আমি তার কন্‌সোলেশান?'

কথাটা বলব-বলব ভেবে সেদিন আবীর সন্ধ্যেবেলায় ভূষণের বাড়ি গিয়ে দেখল সুরপতি বসে আছে।

আবীরকে দেখেই সুরপতি বলল, "তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হল, নয়ত কাল সকালে তোর বাড়ি যেতাম।"

"কী ব্যাপার?" আবীর শুধলো।

"একটা চাকরি আছে, সি এস অফিসে। ভাল চাকরি। করবি?"

আবীর হেসে বলল, "চাকরিটা যেন তোর হাতে নাচছে রে শালা?"

"সে আমার ব্যাপার। আমি কথাবার্তা বলেছি। নাইন্‌টি পার্সেণ্ট চান্স। বাকি টেন্ তোর পরমার হাতে।"

"পরমার হাতে?"

"পরমাদেরই অফিস। ও একবার মিত্তিরসাহেব—মানে কেষ্ট মিত্তিরকে বলবে······।"

আবীর অকারণে কেমন লজ্জা বোধ করল। সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার চাকরির জন্যে পরমাকে ধরতে হবে? তুই শালা বলছিস কী?"

সুরপতি ঠাট্টা করে বলল, "ধরেই তো আছিস বাবা। বাড়িতে ধরে আছিস, অফিসেও ধরে থাক।"

ভূষণ হেসে উঠল। সুরপতিও হাসছিল।

আবীর ঠাট্টার ছলে সুরপতিকে শাসাল। "তোকে একটা অ্যায়সা লাথি মারব—কোমর ভেঙে দেব।......"

সুরপতি বলল, "তা ভাঙিস। আমি কিন্তু সিরিআসলি বলছি।... অতই তোর প্রেস্টিজ যখন, তোর পরমাকে না হয় তুই না বললি। আমরাই চেষ্টা করি। কী বল?"

আবীর মাথা নাড়ল, "না।"

সুরপতি ভূষণের দিকে তাকাল, যেন বলতে চাইল: নে, দেখ—, এবার কী বলবি, বল!

"আমি তোর ব্যাপার কিছু বুঝতে পারি না—" সুরপতি যেন কিছু ক্ষুব্ধ, কিছু বা বিরক্ত হয়ে আবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বালখিল্য থাকার একটা বয়েস আছে। তুই শালা বুড়ো দামড়া হয়ে আর কতদিন বেকার বসে থাকবি! এই তো সেদিন বলছিলি, এবার একটা কিছুতে লেগে পড়বি!"

আবীর শুনল কথাগুলো। হাসল। বলল, "ঠাট্টা করছিলাম।... চাকরিবাকরি আমার দ্বারা হবে না রে। পোষাবে না।"

সুরপতি বেশ বিরক্ত হল। এই নিয়ে সে আবীরের জন্যে অন্তত বার চারেক চাকরির খবরাখবর এনেছে। মোটামুটি কথাবার্তাও বলেছে, অথচ প্রতিবারেই আবীর এড়িয়ে গেছে, না হয় অস্বীকার করেছে। দায় সুরপতির নাকি? সুরপতি খুবই বিতৃষ্ণ হয়ে বলল, "চাকরি তোর পোষাবে না। তুই ভাবছিস তোকেই লোকে সারা জীবন পুষবে।......আচ্ছা নবাব, মাসিমা যে কদিন বেঁচে আছে চালিয়ে যা, তারপর দেখব কে তোকে পোষে?"

ভূষণ হেসে বলল, "তা বলিস না ; পোষার কপাল করে জন্মালে—সারাজীবনই লোকে পোষে, কী বল আবীর ?"

আবীর চাইছিল সুরপতিকে সরিয়ে দিয়ে ভূষণের সঙ্গে কথা বলবে। সুরপতি বেশ চটে গেছে। আপাতত তাকে আর চটাতে সাহস করল না আবীর। বলল, "ভূষণের সঙ্গে আমার দরকার আছে একটু। তুই চাকরিফাকরি থামিয়ে এখন কেটে পড়। দোকানে গিয়ে বোস, আমরা আসছি।"

সুরপতি বলল "আমি বসছি না ; আমাকে একবার স্টেশন-পাড়ার দিকে যেতে হবে। যা শীত পড়ছে, বাইরে আর ঘোরাফেরা যায় না।"

আরও খানিকটা বসে সুরপতি চলে গেল।

আবীর যে-কথাটা বলতে এসেছিল, সেটা কেমন করে বলবে বুঝতে পারছিল না। যদি বলে, 'জানিস ভূষণ, একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, খুব স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। পরমা বলছিল যে তার স্বামীকে দেখতে আমার মতনই ছিল—' তা হলে ভূষণ সহজে বিশ্বাস করে নেবে বলে মনে হয় না। প্রায় একই ধরনের দেখতে দুটো লোক থাকতে পারে—একথা সহজে স্বীকার করে নিলেও ঠিক এই ক্ষেত্রে ভূষণ তা মেনে নেবে না ; হয়ত বলবে : পরমা তোকে ওই সব বলে গলাবার চেষ্টা করছে। ওর মতলব আছে কিছু। ভূষণ আরও কিছু বলতে পারে : চালাকি নাকি ? এতদিন তাহলে কথাটা বলেনি কেন তোকে ? কেন তার স্বামীর ফটো দেখায়নি ?

ভূষণ কী বলবে তা অবশ্য আবীর জোর করে বলতে পারে না। হয়ত সহজেই বিশ্বাস করে নেবে ; ভাল কথাও বলতে পারে।

আবীর একটা সিগারেট চাইল, তারপর বলল, "মিলুকে ডাক। একটু চা খাব।"

ভূষণ তার বোন মিলুকে ডাকল জোরে-জোরে। মিলু এলে আবীরই হেসে বলল, "কী খবর মিলুদিদি ! তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না। একটু চা করে খাওয়াও না।"

মিলু কী একটা কথা বলল। হাসির কথা। আবীর হাসল। চারটে সাধারণ কথার পর মিলু চলে গেল।

আবীর সামান্যক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিগারেটের ধোঁয়া গিলে বলল, "তোর সঙ্গে একটা কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল কথা আছে ভূষণ। একটা বিশ্রী ঝামেলায় পড়েছি।"

ভূষণ তার অবাল্য বন্ধুকে চেনে। আবীরের মুখ দেখে, তার বসার ভঙ্গি দেখে সে বুঝতে পেরেছিল, আবীর কোনো কিছু গোপনে বলতে এসেছে। আজকাল, স্বভাবতই আবীরের কোনো একান্ত ও গোপন কথা থাকলে তা পরমা সম্পর্কেই হবে। ভূষণ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছে, আবীর কখনও-কখনও খুব বেশি অন্যমনস্ক, চিন্তিত হয়ে পড়ছে।

ভূষণ বলল, "কিসের ঝামেলা ? পরমা ?"

আবীর ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করল। "না, ঠিক পরমা নয়—, তবে ওরই ব্যাপার। পিকিউলিয়ার একটা ব্যাপার হয়েছে।"

"কী ব্যাপার ?"

ব্যাপারটা অত সহজ নয় যে আবীর চট করে বলে ফেলবে। ভূষণ বুঝতেই পারছে না, আবীরের বলার বিষয়টা সাধারণ কিছু নয়। হুট করে আবীর যদি বলে, জানিস—পরমার স্বামী আমার মতন দেখতে ছিল—জাস্ট লাইক মী—তবে ভূষণ সেটা বিশ্বাসই করবে না ; বলবে—যা যা ও-রকম অনেক শুনেছি। টোটাল ব্লাফ। আসল কথা বল।

আবীর রীতিমত দ্বিধা এবং সঙ্কোচ বোধ করছিল। তার কথা সে কী করে ভূষণকে বলবে, বিশ্বাস করাতে পারবে!

আবীর ইতস্তত করে বলল, "ব্যাপারটা তুই বিশ্বাস করতে পারবি কি না, ভাবছি। আমার নিজেরই এখন পর্যন্ত কেমন ধোঁকা লাগে।"

বন্ধুর মুখের দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে ভূষণ বলল, "তুই কিছু

না বললে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই ওঠে না। আগে শুনি—।"

"বলছি তোকে। তবে ভাবিস না আমি বানিয়ে বলছি।"

"সেটা আমি জানি শালা, তোকে সাফাই গাইতে হবে না। কী হয়েছে বল।"

আবীর আবার একটা সিগারেট ধরাল। গলা ভর্তি করে ধোঁয়া টানল। বলল, "পরমা তার স্বামীর কথা বলছিল।" থামল আবীর, তারপর নিজেও যেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়—এমন গলায় বলল, "বলছিল যে, তার স্বামী আমার মতনই দেখতে ছিল।"

ভূষণ অবাক চোখ করে তাকাল। "তোর মতন?"

মাথা নাড়ল আবীর। "হ্যাঁ। ব্যাপারটা পিকিউলিয়ার।"

আবীর এবার বিস্তারিত বলল। বলে ভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভূষণ খুবই কৌতূহল বোধ করছিল। ঠাট্টা তামাশা সে করল না। বরং অত্যধিক কৌতূহলের জন্যে সে রীতিমত বিষয়টা নিয়ে যেন ভাবতে লাগল।

আবীর অপেক্ষা করে-করে বলল, "তোর কী মনে হচ্ছে?"

"ভাবছি—। ব্যাপারটা খানিকটা অদ্ভুতই।"

"আমার প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। এ তো গল্প উপন্যাস নয়, প্রিজনার অব জেণ্ডা নয়……"

"না, তা নয়; তবে অবিশ্বাসের কিছু নেই। প্রায় একই রকম দেখতে এমন দুজন লোক দেখা যায়। হামেশাই যায়।…… আমাদের কলেজের কালিদাসবাবুকে তোর মনে নেই? কালিদাসবাবু আর পোস্টমাস্টার চন্দ্রবাবু। কে বলে ওরা মায়ের পেটের যমজ নয়। এ রকম হয়। মিল থাকে, তবে হুবহু মিল বড় দেখা যায় না, এক শুনেছি যমজ ছাড়া।"

আবীর কালিদাসবাবুর কথা ভাবতে লাগল। এটা তার মনে পড়েনি; গণেশ হালুইয়ের কথাটা মনে পড়েছিল।

মিলু এসে চা দিয়ে গেল।

চা খেতে-খেতে ভূষণ বললে, "আবীর, আমার কথাই ফলে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম না যে, মানুষের মধ্যে একটা জিনিস একেবারে আড়ালে-আড়ালে গড়ে ওঠে। ইনার প্রসেস। বাইরে থেকে এটা বোঝা যায় না, দেখাও যায় না। ভেতরে ভেতরে কাজ হয়, তারপর একসময় কন্‌সাস্‌লি আমরা জানতে পারি।"

আবীর লম্বা করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। শব্দ হল একবার। বলল, "তা না হয় হল, কিন্তু আমি আমার কথা জিজ্ঞেস করছি। পরমার স্বামীর মতন আমি অনেকটা দেখতে বলেই কি আমার সঙ্গে ও ইন্‌টিমেসি করেছে?"

"বোধ হয়—"ভূষণ মৃদু গলায় বলল, "হয়ত এই জন্যেই তোর ওপর ঝোঁক পড়েছিল।"

আবীর ক্ষুব্ধ হল। বলল, "তাহলে আমি বলছি, আমি কারও ডুপ্লিকেট হতে রাজী নই। আই হেট ইট।"

ভূষণ আবীরকে ভাল করে দেখতে-দেখতে বলল, "কথাটা তুই বলতে পারিস। তবে সব মানুষই—বেশির ভাগ মানুষই একরকম ডুপ্লিকেট।...যাকগে, তোর সমস্যাটা কিসের?"

সমস্যাটা কিসের ভূষণ কি বুঝতে পারছে না? আবীর কিছুটা বিরক্ত হয়ে বন্ধুকে দেখল। "সোজা সমস্যা। আমি পরমার মরা স্বামীর জ্যান্ত চেহারা হয়ে চালিয়ে যেতে পারি না। চালিয়ে যেতে হলে আমার নিজের ব্যাপারটা মীনিংলেস হয়ে যায়। তুই বুঝছিস না, এরকম হলে আমার কোনো দাম নেই, দাম পরমার মরা স্বামীর—আমি শুধু তার রোল প্লে করছি।"

"শুধুই প্লে—?" ভূষণ বাঁ চোখ টিপে হাসল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আবীর কেমন লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে বলল, "যাঃ, কী বলছিস। সেরকম কিছু না। আমি লোচ্চা নই। পরমাও সেই টাইপের মেয়ে নয়।"

ভূষণ আর কিছু বলল না। চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল,

তার কাপটা সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল।

আবীরও চুপচাপ। অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের দিকে তাকি থাকল। শেষে দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই ব্যাপার আমার একেবারে ভাল লাগছে না। কী রকম একটা অবসেসানে মতন হয়ে যাচ্ছে। সে বেটা মরে ভূত—তবু মাইরি জ্বালাচ্ছে!"

ভূষণ জিজ্ঞেস করল, "কী করে সেই ভদ্রলোক মারা গেল তা তুই জানতে পারলি না?"

"পরমা বলছে না!"

"কেন?"

"কী করে জানব!···রহস্য করে রাখছে।"

"ফটোটা দেখেছিস ভদ্রলোকের?"

"না, কোথায় আর দেখলাম। পরমা দেখাব-দেখাব কর ঝুলিয়ে রেখেছে।"

ভূষণ সিগারেটের ধোঁয়ায় কাশল বার কয়েক। পরে বলল "আচ্ছা আবীর, আমি কোনো ব্যাপারে তোর বড় একটা গ দেখিনি, এই ব্যাপারটা নিয়ে তুই এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছিস কেন?"···

আবীর কথাটা শুনল। কোনো জবাব দিল না।

ভূষণ আবার বলল, "তোর কথা মতন এটাও তো তোর কর চলে না।"

"কী?"

"এই প্রেম, কিংবা ধর বন্ধুত্ব।"

"কেন?"

"কেন কী! তুই বলিস তোর কোনো পার্সোন্যাল অ্যামবিসা নেই; নিজের জন্যে কিছু চাস না। এটা তুই কার জন্যে চাইছিস নিজের জন্যে নয়?"

আবীর একটু সময় যেন ইতস্তত করল, তারপর বলল, "আমা কথা তোরা ঠিক বুঝিসনি। আমি ঠিক এটা বলিনি। তুই অন্যভা

কথাটা ধরছিস। আমার সত্যিই কোনো পার্সোন্যাল অ্যামবিসান নেই।”

“আমি ভাই বুঝতে পারলাম না।”

“তোর বুঝে দরকার নেই।…নে ওঠ, বাইরে চল।”

“বেশ শীত পড়েছে—”ভূষণের যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

আবীর তাগাদা দিয়ে ওঠাল। বলল, “চল, একটু বেড়িয়ে আসি।”

রাস্তায় এসে হাঁটতে-হাঁটতে দুজনে অনেকটা চলে এল, স্কুলের কাছাকাছি। আজ উত্তরের বাতাসে বেশ ধার। পাতলা কুয়াশাও জমেছে। শিরীষ গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে কজন হাত পা সেঁকছিল, পাতা পোড়ার গন্ধ উঠছে।

আবীর বলল, “দেখ ভূষণ, আমি সত্যি-সত্যি কিছু হতে চাই না। কিছু হতে আমার ভাল লাগে না। তুই জানিস, আমি কখনও স্কুলে কিছু হইনি, না ফার্স্ট, না সেকেণ্ড, না শালা থার্ড। স্পোর্টসে আমি আধখানা দৌড়ঝাঁপ করেই ছেড়ে দিতাম—কখনও শেষ পর্যন্ত ছুটি নি। কেননা শেষ পর্যন্ত ছুটলে আমি কিছু একটা হয়ে যেতামই। এমনি খেলাধুলোর সময় তুই আমায় দেখেছিস শালা, চ্যাম্পিয়ান ছিলাম—”বলে আবীর খানিকটা হাসল, হেসে ডান হাতে ভূষণের গলা জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। “তুই হারামজাদা বল, আমি যদি স্কুলে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে চাইতাম, পারতাম না? নিশ্চয় পারতাম। আমি বুদ্ধু হাঁদা ছিলাম না। অথচ আমি কিছু হইনি। তাতে আমার দুঃখ হত না। কলেজে পড়ার সময় মার খুব ইচ্ছে ছিল আমি ভাল করে লেখাপড়া করি। মার অনেক রকম ইচ্ছে ছিল! একটা বড় ইচ্ছে আমায় ডাক্তার করবে।…করবে কোথ্ থেকে, ছেলে শালা যেরকম রেজাল্ট নিয়ে বেরুলো তাতে মিউনিসিপ্যালিটির টিকেবাবু ছাড়া কিছু করা যায় না।…কলেজেও মাইরি কিচ্ছু করলাম না। মা বলত, এটা

হ', ওটা হ'—একটা কিছু ঠিক করে নিয়ে পড়াশোনা কর। দুর —আমি আবার কী হব।...আমার বাবা কিছু হয়েছিল? কিচ্ছু হয়নি। স্রেফ মাকে বিউটিফুল-বিউটিফুল কথা শুনিয়ে, খুশী করে-করে, মন রেখে দিব্যি কাটিয়ে গেছে। অথচ আমার মাকে দেখ, কী ডিটারমিনেসান। সারা জীবন শুধু নিজের মাথা তুলে রাখার জন্যে লড়ে গেল। এসব তোর মাথায় ঢুকবে না।" বলে আবীর ভূষণের গালে একটা চুমু খেল। তার মুখে মদের গন্ধ নেই, তবু মাতালের মতন করে চুমু খেয়ে বলল, "আমার মাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি রে—অ্যাডমায়ার, বাট আই হেট মাই ফাদার, আমার মার সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। ভদ্রলোক চিট ছিল। কিছু না করার জন্যে নয়, স্ত্রীকে তোষামোদ করে, ভুলিয়ে রেখে বাবু হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে। আমি চিট নই। আমি কিছু করি না, করব না—কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস বাত মেরে মেরে নিজের স্বার্থ রাখব না।...দেখ ভূষণ, আমি একেবারে রামশ্যাম হয়ে বেঁচে থাকতে চাই, একেবারে গরুছাগলের মতন। ভেরী সিম্পল, অনেস্ট লাইফ। কোনো রকম গিল্ট না নিয়ে। নিষ্পাপ হয়ে।...অথচ পরমা—ওই পরমাই আমায় ট্রাবলে ফেলেছে। কী করব? হটিয়ে দেব? ভাগিয়ে দেব?...ওর ব্যাপার-ট্যাপার আমার আর ভাল লাগছে না। খারাপ লাগছে।..." বলতে বলতে আবীর হঠাৎ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল।

৮

আবীর এইমাত্র বাড়ি ফিরল। বেরিয়েছিল কোন্ সকালে, আর ফিরল এখন খানিকটা রাত করেই।

বিজনবালা ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ঘন খয়েরী রঙের মাফলারে আবীরের কান-মাথা জড়ানো। চোখমুখ ক্লান্ত ও শুকনো দেখাচ্ছিল। মাফলারটা খুলতে-খুলতে আবীর বলল, "বিজুমা, আজ তুমি খুব বেঁচে গেছ! শিগগির পাঁচ পয়সার হরির লুঠ ছড়িয়ে দাও।"

বিজনবালা কিছু বুঝলেন না, ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিদ্যুতের সঙ্গে আবীর আজ ঝালদা গিয়েছিল, বিদ্যুৎ নিয়ে গিয়েছিল; তার শ্বশুরবাড়ি ঝালদায়, শ্বশুর নাকি আজ-যায়-কাল-যায় অবস্থায় হয়েছে। বিজনবালা ছেলের মুখে এ-সবই শুনেছিলেন। কিন্তু ছেলের ঝালদা যাওয়ার সঙ্গে তাঁর বেঁচে যাওয়ার কী আছে—তা তিনি চট করে বুঝতে পারলেন না।

আবীর বলল, "আজ হয়ে গিয়েছিলাম, তোমার ছেলে ফিনিশ হয়ে যেত, তোমারই কপাল জোরে ফেরত পেলে।"

বিজনবালা শক্ত ধাতের মানুষ, তবু ছেলের কথায় বুকের মধ্যে কোথাও একটু কেঁপে গেল। বললেন, "কী হয়েছিল?"

"গাড়ির চাকা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। আরে ব্বাপ্—আমরা তখন বড় একটা কালভার্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, নীচে—দশ পনেরো হাত নীচে—শুকনো খাল, চাঁই পাথর, তার পাশে মাঠ—। আর একটু হলেই গাড়ি স্ট্রেট নীচে চলে যেত।"

আবীর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বিজন তার আগেই রাগের গলায় বললেন, "তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে···"

"না। আমি না—"

"নিশ্চয় তুমি। বেহায়া।"

"আরে কী আশ্চর্য! আমি বলছি আমি নয়।"

"আমার গোড়াতেই ভুল হয়েছিল। তোমায় লেখাপড়া ন শিখিয়ে সেই পয়সায় একটা ভাঙা গাড়ি কিনে দিলেই হত। ট্যাক্সি চালিয়ে দিন কাটাতে পারতে।"

আবীর হেসে উঠল। "তা যদি করতে বিজুমা—ফার্স্ট ক্লাস হত ইংরিজীতে বলে সেলফ্ হেল্প্ ইজ্ দি বেস্ট হেল্প্।" বলতে-বলতে আবীর গায়ের গরম জহর-কোট খুলে ফেলল। "তা হলে আমি ট্যাক্সিঅলা হয়ে যেতাম।"

বিজন ছেলের সঙ্গে অযথা চেঁচামেচি করলেন না আর। কী হবে! এই ছেলে এই রকমই। বলতে গেলে হাসবে, না হয় রাগ করবে। তবু মনের ভয় তো বিজনবালা দূর করে দিতে পারে না।

বিজন ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। উনুনে পাতলা আঁচ আছে, কয়লাগুঁড়ো দিয়ে এই আঁচটা জিইয়ে রাখতে হয়। কখনো কখনো মকর গুল রেখে দিয়ে যায়। শীতের দিন, খাবার দাবারগুলো গরম করে নেন বিজনবালা নিজেই।

আবীর নিজের ঘরে এল। জামা কাপড় বদলে কলঘরের দিকে চলে গেল।

রাজ্যের ধুলো মাখা হাতে মুখে সাবান ঘষতে-ঘষতে আবীর ভাবল, মাকে গাড়ির চাকা খুলে যাবার কথাটা না বললেই হত বলে মুশকিল হল। রেগে গেল মা। এখন এই রাগ আবার ভাঙাতে হবে। তার মানে খেতে বসে মার মন-মেজাজ বুঝে আস্তে-আস্তে মন গলাতে হবে। তার জন্যে ফন্দি-ফিকির চাই। বাস্তবিক পক্ষে আবীর ঝালদা আসা-যাওয়া করে বেশ ক্লান্ত। কি পেটে পুরে সে বিছানায় ঢুকে যেতে পারলেই বাঁচে।

আবীর কয়েকটা ফন্দির কথা ভেবে নেবার চেষ্টা করল। ত

কিছুই মনে আসছে না। পুরোনো ফিকিরে কাজ চলবে না, নতুন চাই—নিউ।

কলঘর থেকে বেরিয়ে মুখটুখ মুছে, চুল আঁচড়ে, একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে গোবেচারী মুখ এবং ভাব করে মার ঘরে এল আবীর।

শীতের দিনে রাত্রের খাওয়াটা মার ঘরেই হয়।

খাবার সাজিয়ে বিজনবালা বসে ছিলেন। পাশাপাশি মা ও ছেলের আসন।

আবীর বসল। বসে নিজের খাবারটা দেখল। বলল, "ক'টা রুটি দিয়েছ?"

"যা দেওয়া হয়—" বিজন বললেন।

"আমার আরও চাই।"

"আরও আছে।"

"গোটা দশেক—?"

এবার বিজন একটু অবাক হলেন। পনেরো ষোলোখানা রুটি খাওয়ার ছেলে তাঁর নয়। তবু বললেন, "খাও তো আগে।"

আবীর প্রায় পুরো একটা রুটি কপির তরকারির সঙ্গে মুখে পুরে দিল। ফোলা গালে চিবোতে লাগল খানিকটা মজা করেই।

বিজন দেখলেন, কিছু বললেন না।

গলা একটু পরিষ্কার হলে আবীর বলল, "সারাটা দিন খাওয়া হয় নি। কত রকম ঝামেলা যে গেল!"

সঙ্গে-সঙ্গে না হলেও সামান্য পরে বিজন বললেন, "খাওয়া হয় নি কেন?"

"কী করে হবে! একটা লোক মরছে, তখন কি খাওয়া যায়!"

"বিদ্যুতের শ্বশুর কি মারা গেলেন?"

"না। বেঁচে গেলেন।" শেষের কথাটা আবীর হালকা করে বলল।

"বেঁচে গেলেন?"

"মরতে মরতে লাস্ট মোমেণ্টে আটকে গেলেন।"

বিজন বুঝতে পারছিলেন না, একটা লোকের শেষ অবস্থা নিয়ে আবীর এভাবে হালকা করে কথা বলছে কী করে! বিজন যখন মরবেন তখনও কি আবীর এই রকম করবে! কিছুই বলা যায় না, যে-রকম হচ্ছে সব।

"কী হয়েছিল বিদ্যুতের শ্বশুরের?" বিজন শুধোলেন।

"ফোড়া।"

"ফোড়া!" বিজন বেশ অবাক হলেন।

আবীর বলল, "গলার পাশে এক ল্যাঙড়া আম সাইজের ফোড়া হয়ে গলগণ্ডর মতন দেখাচ্ছিল, তার ওপর গালগলা ফুলে একেবারে ডাব। বিদুদার শ্বশুর ভীতু টাইপের লোক। আমরা গিয়ে দেখি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফোড়া কাটা হয়েছে…"

এতক্ষণে বিজন যেন বুঝতে পারলেন সব। যেরকম শোনা গিয়েছিল সেরকম ভয়ের কিছু নয়।

আবীরের গো-গ্রাসে খাবার ভঙ্গিটা বদলে গেছে; সে যেভাবে শুরু করেছিল সেভাবে আর খাচ্ছে না।

বিজন খেতে-খেতে বললেন, "আজ সন্ধ্যের গোড়ায় সেই মেয়েটি এসেছিল।"

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আবীরের, মার চোখের দিকে তাকাল, পলক পড়ছিল না। "কে, পরমা?"

বিজন মাথা নুইয়ে নাড়লেন।

"পরমা এ-বাড়িতে হঠাৎ?" আবীর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল।

"তোমার খোঁজ করতে এসেছিল।"

আবীর মার মুখের দিকে আরও একটু তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সে বুঝতে পারছিল না, পরমা কেন এসেছিল! কোনো দরকার পড়েছিল, না আবীর দিন তিনেক ও বাড়িতে যায় নি বলে খোঁজ করতে এসেছিল? মার সঙ্গে পরিচয় করতে? আবীরদের বাড়ি ঘর দেখতে?

"কিছু বলল?" আবীর জিজ্ঞেস করল।

"না," বিজন মাথা নাড়লেন।

"কিচ্ছু না! ফর নাথিং এল আর চলে গেল?"

"বসে ছিল কিছুক্ষণ।"

আবীর খুবই মুশকিলে পড়ল, মার সঙ্গে এভাবে কথাবার্তা চালালে কিছুই বোঝা যাবে না। মার মন এখনও নরম হয় নি, বরং আবীরের সন্দেহ হচ্ছে—মা ইচ্ছে করেই গম্ভীর মুখে ছোট্ট-ছোট্ট জবাব দিচ্ছে, আবীরকে খানিকটা জব্দ করার জন্যেই বোধ হয়।

সামান্য ভেবে নিল আবীর, তারপর বলল, "আমার মনে হচ্ছে তোমায় দেখতে এসেছিল। অনেক দিন থেকে আসব-আসব করছিল। তোমার যেরকম নামডাক চারপাশে। তার ওপর আমার পাবলিসিটি···"

বিজন কথার কোনো জবাব দিলেন না।

অল্প অপেক্ষা করে আবীর বলল, "সত্যি মা, তুমি যদি ভোটে দাঁড়াও জিতে যাবে। লেডী ডাক্তার বিজনবালার সাঙ্ঘাতিক পপুলারিটি। আমি চোঙা মুখে নিয়ে ক্যানভাস করব; বলব: আমার মা বিজনবালার তুলনা নেই, অতুলনীয় মহিলা, আদর্শ জননী, ভারতীয় নারীসমাজের আদর্শ···।" বলতে-বলতে আবীর এঁটো হাত মার মুখের দিকে নিয়ে গিয়ে গোল করে ঘুরিয়ে নিল। "কী ফেস্! দেবী-টেবীর মতন!"

বিরক্তির ভাব করে ভুরু কুঁচকে বিজন বললেন, "কী হচ্ছে। এঁটো হাতটা আমার মুখের সামনে থেকে সরাও।"

"আমি কি তোমার গালে এঁটো হাত ছোঁয়াচ্ছি! স্রেফ ফেস্‌টা দেখাচ্ছি।"

"না, তুমি আমায় এঁটো করে দেবে।"

"আমি নিরামিষ খাচ্ছি, ডিম পিঁয়াজ মাছ নেই, তোমার মুখ ছুঁয়ে দিলেই বা কী! তুমি আমার এঁটো খাবে। কত খেয়েছ আগে। ছেলের এঁটো কিছু নয়—নাথিং।"

বাঁ হাতে আবীরের এঁটো হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিজন বললেন, "না, তুমি আমার ছেলে নও।"

আবীর হো হো করে হেসে উঠল। "তুমি কি আমার সৎমা? আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে, পেয়ে মানুষ করেছ? আমি অনাথ?"

কত আর সহ্য করেন বিজন! এই ছেলেই তাঁকে পাগল করবে। বললেন, "না, তুমি অনাথ নও; কিন্তু একদিন তুমিই আমায় অনাথ করবে।"

আবীর মুখের ভাবটা বেচারীর মতন করে ফেলল। চুপ করে থাকল সামান্য। খুব যেন অনুতপ্ত এমন ভাব করে বলল, "আমি আর গাড়িফাড়ি ছোঁব না, মা; সত্যি বলছি। প্রমিস। তুমি প্লীজ হেসে ফেল। প্লীজ···"

বিজনকে শেষ পর্যন্ত হাসিমুখ করতেই হল। আবীর তাতেই খুশী।

"পরমা হুম্ করে তোমার কাছে চলে এল!" আবীর বলল, "ব্যাপারটা কী?"

"মানুষের বাড়িতে মানুষ আসে; ব্যাপার আবার কী!"

"আমার কথা কিছু বলল?"

"কদিন তুই যাস না—তাই খোঁজ করতে এসেছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হল। তোকে তো অনেকবার বলেছি, অত বন্ধু যখন তোর, একবার বাড়িতে নিয়ে আয়। আসছিলি না কেন?"

আবীর তখন অন্য কথা ভাবতে শুরু করেছিল। মাকে একবার জিজ্ঞেস করবে—আচ্ছা মা, দুজন মানুষ একরকম দেখতে হয়—এ তুমি বিশ্বাস কর? কেন হয়? কেমন করে হয়? তুমি কি কম কাচ্চাবাচ্চাকে এ-জগতে এনেছ, তুমি হয়ত বলতে পারবে। কিন্তু আবীর কি মাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতে পারে! মা কী ভাববে? যদি জানতে চায়, কেন বল তো, হঠাৎ তোর এমন কথা মনে এল কেন, তখন আবীর কী জবাব দেবে!

বিজন বললেন, "তোর বন্ধু বেশিক্ষণ বসল না। দেখতে ভালই

য়েটি। বেশ ভব্যসভ্য কথাবার্তা। কিন্তু ও তোর চেয়ে বয়েসে শ্চয় বড়।"

মার কথা থেকে আবীরের মনে হল, মা যেন আবীরের জন্য য়ে পছন্দ করছে। আবীর বলল, "হ্যাঁ, আমার ঠাকুমার বয়েসী। ··যাকগে, আমায় একটা কথা বলো তো।"

"কী?"

"দুজন মানুষ একরকম দেখতে হয়?"

বিজনবালা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, যেন প্রশ্নটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। বললেন, "কী, বলছিস কী?"

"বলছি, একই রকম দেখতে অনেকটা দুজন মানুষ তুমি দেখেছ কি না?"

"কেন দেখব না! হুবহু এক দেখেছি। তারা অবশ্য যমজ ছিল।···তা হঠাৎ তোর মাথায় এ-ভাবনা কেন?"

"এমনি।···আমি একটা দেখলাম। আগেও দেখেছি—আমাদের এক মাস্টারমশাই আর পোস্ট অফিসের বড়বাবু; গণেশ হালুইকর আর তার ভাই।···এ-রকম হয় তা হলে?"

"অনেক হয়। যুদ্ধের সময় হাসপাতালে একবার দেখেছি—এক মিলিটারী সাহেব মারা গেল। ছেলেমানুষ। মাস খানেক পরে আবার একজন পা খোঁড়া করে এল, অবিকল সেই রকম দেখতে, আমরা ওই নিয়ে কত গল্প করতাম নিজেদের মধ্যে।"

আবীর জল খেল। তার খাওয়াও শেষ। সে সত্যি-সত্যি তার পাতে যা ছিল তার বেশি খেল না। বলল, "এ-রকম কেন হয়?"

বিজন এমন প্রশ্নের জবাব জানেন না। বললেন, "অত জানি না। হয় দেখেছি। মা-বাপের আদলে ছেলেমেয়ে হয়, যমজ তো একই রকমের হয় দেখেছি। তা ছাড়াও হয়। কেন হয় কী করে বলব। ভগবানের খেয়ালে হয় হয় তো।"

"ভগবানের খেয়াল···!"

"সংসারে অনেক কিছু অবাক হবার মতন জিনিস হয়। কেন

হয়—তা কেউ বলতে পারে না। মানুষের এই বিচিত্র শরীর
কী করে হয়ে উঠল, কেমন করে এত জিনিস কাজ করে যা
কেউ বলতে পারে। খুঁটিয়ে ভাবলে কোনো কিছুর জবাব পাও
যাবে না, শুধু অবাক হতে হবে। যা আছে, যা দেখছি—ত
মেনে নেওয়া ভাল।"

আবীর আর কিছু বলল না। বরং তার মনে হল, মা
এসব প্রশ্ন করারই কোনো মানে হয় না; কেননা সে আজ পরম
কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে। ওই চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে ত
বাস্তবিক কোনো দ্বিধা আর নেই। যা আছে সেটা অন্য জিনিস।

আবীর উঠে পড়ল।

সারা দিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও আবীরের ঘুম আসছিল না। পরম
কথাই তার মনে পড়ছিল। তার অদর্শনে পরমা কি ব্যাকুল হ
উঠল? মনে হয় না। তা হলে? আবীর এখন মাঝে-মা
ডুব মেরে দিচ্ছে বলে কি পরমা অবাক হচ্ছে খানিকটা? কি
ভাবতে শুরু করেছে? কে জানে! বা এমনও হতে পারে-
পরমা ইদানীং আবীরের ব্যবহার থেকে কিছু লক্ষ করছে, সন্দে
করছে। হয়ত তার সন্দেহ হচ্ছে, আবীর এবার ও-বাড়ি ছাড়বে
কিন্তু এমন মনে হলেই পরমা ছুটে আসবে কেন? পরিচয়
আকর্ষণ? আবীরের মধ্যে তার মৃত স্বামীকে দর্শন? হ্যা
শালা! আমি তোমার স্বামী নই, কখনো ছিলাম না। তু
তোমার স্বামীকে খুঁজতে চাও খোঁজো, তাকে দেখতে চাও—
তার ফটো এনলার্জ করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখো, তার ছবি সি
আধুলি সাইজের করে তোমার গলার হারের লকেটে ঝুলিয়ে রা
আর সারা দিনে তুমি মাইরি হাজারবার তোমার স্বামীকে দেখ
কিন্তু আমার জ্বালিয়ো না। প্লীজ, আমায় ওই এম্প্‌টি জায়গা
ফিল-আপ্-দি-গ্যাপ্ করে নিয়ো না। দোহাই তোমার।

আবীর পাশ ফিরে বালিশে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে তা

ভাবনাটাবনা বন্ধ করতে চাইল যেন। চোখ, নাক, কপাল বালিশে ডুবে থাকলে বাস্তবিক পক্ষে ভাবনাগুলো কিছুক্ষণ পথ-বন্ধ হয়ে যায়।

উপুড় হয়ে শুয়ে, বালিশে নাকমুখ গুঁজে, চোখ বন্ধ করে আবীর ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তবু ঘুম আসছে না। মনটাকে সে ফাঁকা রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ফাঁকা থাকছে না। মনে হবে, আবীর যেন চার পাশের দরজা জানলা বন্ধ করে এই কুঠরিটাকে অন্ধকার করে ফেলতে চায়, অথচ সে পারছে না, কোনো অদ্ভুত ফাঁক-ফোকর থেকে বাইরের আলো এসে যাচ্ছে, তাকে সামলানো যাচ্ছে না। বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল আবীর, কী মুশকিল, যত বাজে ভাবনা কি তাকে রাত্রে ঘুমোতে দেবে না!

উপুড় থেকে এবার আবার সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল আবীর, চোখ বন্ধই রাখল। তারপর বেশ বুঝতে পারল সে চটে উঠেছে। পরমার স্বামীর ওপরই। লোকটা যদিও তার দেখা নয়, চেনাজানা নয়, তবু একটা কাল্পনিক চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাকে হাঁকিয়ে দেবার জন্যে বেশ রুক্ষ চোখেই যেন আবীর পরমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটা আবীরের চোখে চোখ রেখে কদাকার এক হাসির মুখ করল। এমন নোঙরা, জঘন্য, বিদ্বেষপূর্ণ হাসি যে আবীর কিছু বলার শক্তি পেল না। এই হাসির কী মানে? কী বলতে চাও তুমি?

লোকটা এর পরই উধাও। তার হাসিটাকে যেন আবীরের চারপাশে দূষিত পদার্থের মতন ছড়িয়ে সে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল।

আবীর চোখের পাতা খুলে ফেলল। কেননা গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে অসহ্য লাগছিল। অন্ধকারে খানিকটা তাকিয়ে থাকল, পরমার স্বামী যে নেই যেন নিঃসন্দেহে জানার জন্যে তাকে অন্ধকারে নিজেকে অনুভব করতে হল।

সামান্য পরে আবার চোখের পাতা বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আবীর। এবার, সামান্য পরে পরমা নিজেই এসে হাজির।

আবীরের কথা বলতে ইচ্ছেই করছিল না। পরমার ওপরও সে অসন্তুষ্ট।

পরমা যেন জেনেই ফেলেছে আবীর কেন অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। বলল, আমার স্বামী তোমায় খুব জ্বালাচ্ছে?

জবাব দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল না আবীরের। তবু বলল, তোমার স্বামী আমার কাছে আসছে কেন?

আমি কি পাঠাচ্ছি?

সে আসবে কেন? আমার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক! আবীর ক্রুদ্ধ হয়ে বলল।

আমি কী করে জানব?

তুমি জান।

না।

হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি জান, তোমার সেই স্বামী আমায় পছন্দ করছে না। সে ভাবছে আমি তোমায় হাত করে ফেলেছি।

ভাবুক।

ভাবুক?

সে ভাবলে তোমার কী! সে কি বেঁচে আছে, সে কি তোমায়-আমায় দেখতে আসছে?

তা হলে আসছে কেন?

তোমার দেখছি ভূত দেখার অবস্থা হয়েছে। লোকটা মরে গেছে, মরে গেছে—, বুঝলে।

আবীর একটু সময় চুপ করে থেকে বলল: লোকটা যদি মরেই গিয়ে থাকে—তাহলে তুমি আমায় দেখে তার কথা ভাব কেন?

পরমা যেন এরকম কথার কোনো জবাব দিতে না পেরে অধৈর্য হয়ে শুধু বলল, আশ্চর্য!

আবীর বলল, হ্যাঁ—আশ্চর্যই!

তোমার সমস্ত মনগড়া, পরমা বলল, তুমিই তাকে আনছ, নয়ত সে আসে না। যে নেই তার আসা সম্ভব নয়।

যে আছে সে তোমার স্বামীর নকল হতে পারে না।

পরমার বোধ হয় আর অকারণ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্তি হল না। সে চলে গেল।

আবীর আবার চোখের পাতা খুলে অন্ধকারে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। না, পরমা নেই।

আচমকা আবীরের মনে হল সে কোতোয়ালির পেটা ঘড়িতে শব্দ শুনল। একটা কি দুটো। খেয়াল করতে পারল না, কটা শুনেছে। বোধ হয় একটা। রাত একটা বেজে গেল। সে পাগলা হয়ে যাবে নাকি? কোথ্ থেকে এক পরমার স্বামী জুটে তাকে আচ্ছা ঝামেলায় ফেলেছে তো। এ শালা সেই ভূত নাকি? Thy bones are marrowless, thy blood is cold; Thou hast no speculation in those eyes.........। তারপর? তারপর আবীর আর মনে করতে পারল না। এটাও যে মনে পড়ল এই যেন যথেষ্ট।

মনে পড়ার কোনো কারণও নেই। এ-সব কলেজ-টলেজে পড়ার সময় মুখস্থ করতে হয়েছিল। বোধ হয় ম্যাকবেথ-এ আছে। আবীরের ভাল লাগত বলে কিছু-কিছু খুব আওড়াত। হয়ত তাই মনে আছে এক-আধটা লাইন।

বিছানার ওপর উঠে বসল আবীর। জলটল খেয়ে আবার শুতে হবে। এবার সে ঘুমোবে। পরমার স্বামীফামী তাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছে। আর নয়।

৯

চঞ্চলের মনিহারী দোকানে বসেছিল আবীর। বসে বসে দোকানদারি করছিল। চঞ্চল দোকানে নেই, বাড়িতে গেছে, তার মা কাশী যাচ্ছেন, চঞ্চলকে স্টেশনে যেতে হবে মাকে গাড়িতে তুলে দিতে। দোকানের কাচের গ্লাসে চা খেতে-খেতে আবীর চঞ্চলের দোকান দেখছিল। সকালের ভিড় এখন নেই, তবু টুকটাক খদ্দের আসছে। কাউকে জুতোর কালি, কাউকে ব্লেড, কাউকে গুঁড়ো দুধটুধ বিক্রী করতে হচ্ছে। ওরই মধ্যে দু-চারটে বাচ্চা এসে যাচ্ছে। পরীক্ষা শেষ, কাজেই খাতা কাগজ পেন্সিলের চাহিদাটা একেবারেই নেই, তার বদলে বাদাম-তক্তি, লজেন্স, কিংবা শাটল্ কর্ক বেচতে হচ্ছে। আবীর নিজে এক সময়ে ভাল ব্যাডমিন্টন খেলত। ফলে বাচ্চারা কর্ক কিনতে এসে শক্ত-শক্ত ধাঁধা ফেলে দিয়ে আবীরের মতামত জেনে নিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে চলে যাচ্ছে। ওরই মধ্যে বুলি এল ফিতে কিনতে, টুকলি এল ছ' নম্বর উলের কাঁটা কিনতে। আবীরের দোকানদারি যতটা তার চেয়ে বেশি বাচ্চা ছেলেমেয়ে-গুলোকে নাচানো কিংবা খ্যাপানো।

আপাতত আর কোনো খদ্দের নেই দোকানে। বেলা হয়ে গেছে। আবীর উঁচু টুলটার ওপর বসে-বসে রাস্তা দেখছিল। শীতের রোদ সামনের রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, রঙ দেখে মনে হচ্ছে কোথাও কোনো খাদ নেই ; অনেক দিনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা এই বুড়ো বয়সে শীতের রোদ পুইয়ে যেন বেশ খুশী-খুশী মুখে রাস্তার লোক দেখছে। কার বাড়িতে বোধ হয় খাওয়াদাওয়া আছে, একটা বাজার-মুটে বিস্তর কপি-কড়াইশুঁটি-টমাটো-আলুফালু চাপিয়ে চলে গেল, ওদিকে গোটা চারেক ছেলে ক্রিকেট ব্যাট হাতে করে বল লুফতে-লুফতে যাচ্ছে।

অফিসের বেলা হয়ে গেছে অথচ পরমা অফিস যাচ্ছে না। আবীর অনেকক্ষণ থেকেই রাস্তা দেখছিল। পরমা কেন অফিস যাচ্ছে না ভাবতে গিয়ে আবীরের মনে হল, বোধ হয় পরমার ছুটি আজ। কিসের ছুটি তাও আন্দাজ করা যায়—বড়দিনের। পরমা তাদের বাড়ি থেকে ঘুরে যাবার পর, পরের দিনই আবীর পরমার বাড়ি গিয়েছিল, তারপর আজ দিন দুই আর পরমার বাড়ি যাওয়া হয় নি। গত পরশু আবীররা গিয়েছিল তাদের পিকনিক করতে। ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গেল। গতকাল আবীর মার পাল্লায় পড়েছিল। মার সেই বাড়ি! আবীরকে মার সঙ্গে কম করেও তিন জায়গায় যেতে হয়েছে। তবু আবীর পরমার কাছে যেতে পারত, কিন্তু কী ভেবে যায় নি। আজকাল সে মাঝে-মাঝেই পরমার বাড়ি যাচ্ছে না। দু চার দিন করে ডুব দিয়ে থাকছে। ও-বাড়িতে না যাওয়ার কোনো স্পষ্ট কৈফিয়ত নেই, এমনিই যাচ্ছে না আবীর। দেখছে, তার মন এতে কতটা ছটফট করে, বা কী পরিমাণ খারাপ হয়।

তেমন কিছু হচ্ছে কী ?

না, আবীর দেখছে, সেই রকম মারাত্মক কিছুই হচ্ছে না। জীবনে অনেক আকর্ষণ আবীর বেশ ভদ্রভাবে ছেড়ে আসতে পেরেছে, কিংবা বলা যায়—আবীর যখনই দেখেছে কোনো ব্যাপারে তার আকর্ষণ বাড়ছে—তখনই ধরে নিয়েছে, সে একটা মোহের মধ্যে পা বাড়াচ্ছে, বা তার মায়া বেড়ে যাচ্ছে। এ-রকম মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার সন্দেহ হয়েছে, আবীর কোনো আসক্তির দাস হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ হলেই আবীর আর ওদিকে পা বাড়ায় নি, সরাসরি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, নিয়ে বলেছে : 'গুড বাই মিস্টার চিপস।' এই কথাটা আবীরের এক ধরনের মুদ্রাদোষ। বন্ধুদের মধ্যে এক সময় সে খুব চল করে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল, কী বা এর অর্থ—তার নিশ্চয় জবাব দিতে পারবে না আবীর। কিন্তু দিয়েছিল। ওই সিনেমাটা দেখার পর থেকে এটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরমাকে এইবার আবীর 'গুড বাই মিস্টার চিপস্' করবে ভাবছে।

মাঝে-মাঝে তার মনে হচ্ছে: এবার এটা করা উচিত। কেননা এভাবে চলতে পারে না। চলা উচিত নয়। পরমা তাকে দিয়ে কী ধরনের শখ মেটাচ্ছে আবীর জানে না। কিন্তু আবীর বুঝতে পারছে, তার মাথায় পরমা ভর করে বসছে। এরপর কী হবে আবীর মোটামুটি বুঝতে পারে। না, আবীর ঠিক সেটা চায় না। চাইতে হলে আবীরকে এরপর যেখানে যেতে হবে সেখানে ওই প্রশ্নটা এসে দাঁড়ায়: হারা কিংবা জেতা। আবীর চেষ্টা করলে দেখবে, জিত; আবীরের জিত হয়েছে। পরমার কাছে সে জিতে যাবে, পরমাকেই জিতে যাবে।···দূর—এরকম জিত আবীর কখনও চায়নি। চাইলে সে কি পারত না? স্কুলে, কলেজে, খেলার মাঠে, বারোয়ারী পুজোর মাতব্বরিতে আবীর কখনও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চায় নি। নামা মানেই নিজের জন্যে কিছু করে ফেলা। নিজের জন্যে কিছু করার ঝোঁক একবার পেয়ে বসলে তার শেষ নেই। মানুষ তখন সবরকম হতে পারে। নোঙরা, নীচ, স্বার্থপর, খচ্চর, ধাপ্পাবাজ, দাম্ভিক···শালা একেবারে পুরোপুরি দশ মাথার একটা পাপী জীব। আবীর ওর মধ্যে নেই। আমি কখনও নিজের কথা ভেবে, নিজের জন্যে কিছু করব না, করা মানেই আবীর নিজেই গুড বাই মিস্টার চিপস্ হয়ে যাবে। না মানিক, তা হবে না। আবীর—আবীরই। সে এই রকম থাকবে, একেবারে সাধাসিধে একটা লোক, কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে না, সে বিগ হতে চাইবে না, ঝানু হতে চাইবে না, পাকা খচ্চর হবে না, শালা কোনোরকমে সিঁড়ি টপকে-টপকে উঁচুতে কোথাও একটু জায়গা করতে পারলে নীচের লোকদের লাথি মেরে সরাতে-সরাতে পাশের লোককে গুঁতো মারতে-মারতে ঠেলে ফেলে দিয়ে আর-একটা চওড়া ধাপে ওঠার জন্যে ছটফট করে মরবে না। না, না, নেভার। আবীর কি এই দুনিয়াকে দেখছে না? নাকি চিনতে পারছে না? বেশ চিনতে পারছে, চমৎকার করে দেখতে পাচ্ছে। আমি বলছি, তোমরা চারদিক থেকে বসে কবর খুঁড়ছো। মাটি চাপা দেবার সময় দেখবে তোমাদের আশেপাশে কেউ নেই।

তোমরাই কবরের নীচে পড়ে গেছ। আমি শালা তোমাদের রাস্তায় নেই। লীভ মি অ্যালোন। আমি এইভাবে থাকব, যখন দেখব মা আর নেই, থাকা যাচ্ছে না, আমি মুদিটুদি হয়ে যাব, হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, না হয় ফুচকাওয়ালা…। ধ্যাত শালা, হোমিওপ্যাথী ডাক্তার কি ফুচকাওয়ালা হওয়া কিংবা মুদি হওয়া কি সোজা। আবীর হো হো করে হেসে ফেলল।

খেয়াল হতে আবীর দেখল, দোকানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শেফালী দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

আবীর সামান্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিল। বলল, "একটা হাসির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসছিলাম।…তারপর তুমি যে? কী মনে করে?"

শেফালী আরও একটু দেখল আবীরকে। বলল, "চঞ্চলদা নেই?"

"না, বাড়িতে গিয়েছে ; ওর মাকে স্টেশনে পৌছে দিতে হবে।"

"ও!"

আবীর শেফালীকে দেখল। সেই রোগাটে শেফালী এখন বেশ ছিপছিপে হয়ে গেছে। চোখ দুটো আরও টলটলে হয়েছে, মুখে লাবণ্য। অনেকদিন শেফালীকে সামনা-সামনি দেখেনি আবীর।

"কিছু নেবে নাকি?" আবীর হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

শেফালী যেন কিছু ভাবল, তারপর বলল, "না থাক, পরে আসব।"

"কেন? আমি রয়েছি। কী নেবে নাও। চঞ্চল আমায় দোকান দেখতে বসিয়ে গেছে।"

শেফালী ইতস্তত করে বলল, "একটা হরলিকস নিতাম। চঞ্চলদা না থাকলে…"

শেফালীকে দেখতে-দেখতে আবীর সমস্ত ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারল। শেফালী এখন দাম দিতে পারবে না, চঞ্চল না থাকায় তার অসুবিধে হচ্ছে, আবীরকে ধার দেওয়ার কথা বলতে পারছে না।

আবীর মাথা ঘুরিয়ে কাচের আড়ালে হরলিকস খুঁজতে-খুঁজতে বলল, "দামটা আমি জানি না। তুমি পরে চঞ্চলকে দিয়ে যেও।" এমন-ভাবে কথাটা বলল আবীর, যেন দাম না-জানার জন্যেই সে দাম চাইতে পারছে না।

উঠে হরলিকস পেড়ে এনে আবীর শিশিটা এগিয়ে দিল।

শেফালী বলল, "দোকানে বসেছ, দাম জানো না?"

"না," আবীর হাসল। "হরলিকস কি খাই?"

হরলিকসটা নিয়ে নিল শেফালী। নেবার সময় তার চোখে পড়ল, লেবেলের ওপর নীল পেন্‌সিলে দাম লেখা আছে, স্পষ্ট করেই। আবীরের এটা চোখে না পড়ার কোনো কারণ নেই। আবীরের চোখে চোখে তাকাল শেফালী। বলল, "দামটা লেখা আছে।" বলে আর দাঁড়াল না শেফালী, সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

আবীর দেখল, শেফালী চলে যাচ্ছে। শীতের রোদের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে-যেতে শেফালী যখন অনেকটা চলে গিয়ে মোড় ঘুরছে, আবীরের ইচ্ছে হল, চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, কোথায় লেখা আছে বলো? কোথায়?

শেফালীকে আর দেখা গেল না।

আবীর চুপ করে বসে থাক্‌ল। উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর বড় করে নিশ্বাস ফেলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। ধরাল।

শেফালীটা বোকা। এখনও মনে-মনে অভিমান-টান পুষে রেখেছে বোধ হয়। আরে, তুমি শেফালী, তোমাকে ভাই আমি কি করে প্রেমট্রেম করতে পারি বলো! স্নেহটেহ, মায়া করেছিলাম নিশ্চয়, কিন্তু তুমি যে অন্য লাইনে যেতে লাগলে তাতেই ব্যাপারটা ফিনিশ হয়ে গেল। আমি কি বুঝেছিলাম তখন, যে তুমি—যার সাবালিকা হবার মতন পুরো বয়সটাও হয় নি,—সংসারের দায়ে পড়ে প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনের চাকরি খুঁজছ—সেই মেয়ে আমায় ভালবাসার পাত্র ঠিক করে নেবে! ব্যাপারটা বেয়াড়া দেখে আমি আর স্নেহটেহর মধ্যে থাকলাম না। থাকলেই তোমার বারোটা

বাজত। কিন্তু এ-সব অনেক দিনের ব্যাপার। পুরোনো জিনিস। তোমার মনে এখনও সেই কাঁটা ফুটে আছে নাকি! খচখচ করে! তুমি একেবারে বোকা শেফালী, ছেলেমানুষ। তোমার এখন বেশ চেহারা হয়েছে। এবার একটা বিয়ে টিয়ে লাগিয়ে দাও।

এমন সময় আবীর দেখল, রাস্তা দিয়ে ধুনুরী যাচ্ছে। দেখেই তার মনে পড়ল সেই শব্দটা—ধুন্ ধুন্···ধুন্।

আবীরের আচমকা মনে হল সে মুদি, হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, কিংবা ফুচকাওয়ালা না হয়ে ধুনুরীও তো হয়ে যেতে পার।

যেন সত্যি-সত্যি ধুনুরী হয়ে যাচ্ছে আবীর, বেশ জোরে-জোরে বলল, শেফালী আমি ধুনুরী হয়ে যাব। খুব শীগগির। তোমার বাড়িতে যাব একদিন। পুরোনো কিছু থাকলে দিও, ধুনে দেব।

না, শেফালী দেবে না।

আবীর লম্বা করে সিগারেট টানতে গিয়ে জোরে বিষম খেল। তারপর তার চোখে জল এল।

১০

এখন আর পার্কের ফোয়ারা দিয়ে জল পড়ছে না। পরী-গোছের পাথরের মূর্তিটা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তার কোমরের তলায় তিন পাশে তিনটে সিংহের মুখ, পরীর ছায়া পড়েছে একদিকে পাতলা করে, অন্যদিকে সিংহের মাথায় কুয়াশা জড়ানে জ্যোৎস্না। ফোয়ারার চারপাশে গোল করে জলের বৃত্ত, বাঁধানে বেদী। জলে ক'টা শালুক পাতা, কিংবা পদ্মপাতা।

পরমা গায়ের শালের খানিকটা মাথায় তুলে দিল। হি পড়ছে বেশ।

আবীর তার অনেককালের পুরোনো লম্বা গরম কোটটার কলা তুলে দিয়ে বলল, "নদীর বাতাস আসছে। তোমার শীত করছে খুব ?"

পরমা বলল, "করছে খানিকটা।"

হাঁটতে-হাঁটতে আবীর বলল, "জলের কাছ থেকে সরে চলো। বলে ফোয়ারার পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

পার্কের ওদিকে তবু কিছু আলো, দূরে-দূরে। নয়ত অন্ধকা জ্যোৎস্নায় যেটুকু স্পষ্ট হয়ে আছে।

এখনও কাজ চলছে পার্কের, রাস্তায় রোলার পড়ে আছে কোথাও-কোথাও পাথরকুচি, কিছু-কিছু পুরোনো গাছই যা ডালপাল মেলে দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নয়ত নতুন গাছগুলো এখনও মা ছাড়াতে পারে নি। তবু এই শীতের সন্ধ্যায় কদাচিৎ পাখির পা ঝাপটানোর শব্দ, তন্দ্রাবিষ্ট বিহঙ্গের আচমকা গলা শোনা যাচ্ছিল।

আমলকী গাছের তলা দিয়ে সামান্য এসে সিমেন্টের বেি পাওয়া গেল।

আবীর বলল, "এখানেই বসি।"

পরমা আপত্তি করল না। বসল।

আবীর পকেটে সিগারেট হাতড়াতে লাগল।

পরমা আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদ খানিকটা পুরন্ত, হিমের ওপারে চাঁদ, কারখানার কিছু ছড়ানো ধোঁয়াও হয়ত আকাশে জমে রয়েছে। কাছাকাছি কোথাও শীতের মরসুমী ফুলের মিশ্রিত একটা গন্ধ উঠেছে।

"তুমি আমায় এত দূরে পার্কে টেনে আনলে কেন?" পরমা বলল, "এই ঠাণ্ডায় এখন কেউ পার্কে আসে? পাগল!"

আবীর সিগারেট খুঁজে পেয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়েছিল, অন্য হাতে দেশলাই, দেশলাইয়ের বাক্সটা নড়ে উঠে শব্দ হল। "বেড়াতে এলাম। আর কোথায় যাব!···আমার ভালই লাগছে।"

পরমা ঘোমটার মতন করে যেটুকু শাল মাথায় তুলেছিল তা আরও একটু কমিয়ে নিল। যেন আবীরকে দেখার জন্যেই।

আবীর সিগারেটটা ধরিয়ে কাঠিটা জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করল, বাতাসে নিবে গেল। কেউ কোনো কথা বলছিল না।

শেষে পরমা বলল, "তুমি আমার ওপর অখুশী হয়ে উঠেছ! তাই না?"

আবীর কোনো জবাব দিল না।

বাঁকানো শিখার মতন করে দৃষ্টি তুলে পরমা আবীরকে দেখল, অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "তাই না?"

"হ্যাঁ—" আবীর বলল।

"কেন?"

আবীর একরাশ পাতাগাছের মাথায় বিষণ্ণ জ্যোৎস্না দেখতে-দেখতে সিগারেট খাচ্ছিল।

পরমা বলল, "আমি জানি।"

"জান? কী জান?"

"আমার স্বামীকে তোমার সহ্য হচ্ছে না।"

আবীর পরমার মুখের দিকে তাকাল। কথাটা একেবারে নতুন বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, তবু এখন তার ভাল লাগল না শুনতে। যে-ভাবে পরমা বলল তাতে মনে হবে, আবীর পরমার স্বামীকে হিংসে করছে। আবীরের কানে এটা খারাপই শোনাল। সে বলল, "যে নেই তাকে আমার সহ্য হবে না কেন!"

"কী করে বলব! আমিও তো তাই ভাবি।"

"তুমি ভাব একটা মরা মানুষকে আমি সহ্য করতে পারছি না। কেন ভাব?"

"জানি না, পারছ যে না দেখতে পাচ্ছি।"

আবীর খানিকটা ক্রুদ্ধ হল। বলল, "মরা মানুষের সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া থাকতে পারে না।...তুমিই ভদ্রলোককে টেনে এনেছ। অথচ তোমার সাহস নেই, আমাকে বিশ্বাসও নেই—তার সম্পর্কে কিছু বলো। কেন?"

এবার পরমা নীরব হয়ে থাকল।

আবীর সামান্য পাশ ফিরে বসল, পরমাকে যেন মুখোমুখি দেখতে চায়।

"একটা কথা তোমাকে আজ আমি স্ট্রেটকাট্ বলে ফেলি—" আবীর বলল, গলায় কিছু উত্তেজনা, "তুমি আমায় তোমার স্বামীর ডুপ্লিকেট হিসেবে নিয়ে থাকলে ভুল করেছ। আমি কারও ডুপ্লিকেট নই।"

পরমা কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না, সে সামনে তাকিয়ে ছিল, যেন কিছু দেখছিল। কয়েকটা জোনাকি ফোয়ারার দিকে কোনও ঝোপে-ঝাড়ে নাচতে-নাচতে পাক খাচ্ছে। উত্তরের বাতাস বড় তীক্ষ্ণ। পরমার হাতের আঙুল ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। শালের তলায় হাত আড়াল করল পরমা। পরে বলল, "আমার স্বামীর কথা জানতে চাও?...বেশ বলো, কী বলব?"

আবীর চুপ করে থাকল; চারপাশে যে ঝিঁঝি ডাকছে এতক্ষণে তার কানে গেল। এই স্তব্ধতা, ভিজে জ্যোৎস্না, শীত, হিম এবং

ঝিঁঝির ডাক—সব মিলেমিশে অসাড় স্টেশনে দাঁড়ানো মাঝরাতের রেলগাড়ির মতন সে যেন কোথাও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অনেকটা সময় নীরব থাকল পরমা। তারপর বলল, "আমি তোমায় আগেই বলেছি, আমার স্বামীর চেহারার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে। এমনই মিল, আমি প্রথম দিন তোমায় দেখে চমকে উঠেছিলাম।"

আবীর হাতের সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল, আগুনের ফুলকি জোনাকির মতন উড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পড়ল।

"চেহারায় মিল থাকলেও স্বভাবে তোমাদের কোথাও মিল নেই। তোমাকে আমি তাও বলেছি—" পরমা থেমে-থেমে বলল, "এরপর তোমার হয়ত মনে হবে, আমি যখন অত মিল-মিল করে চেঁচাচ্ছি তখন নিশ্চয় আমার স্বামী আমার মনে খুব বড় করে বসে আছে। তা নয় কিন্তু, সে-ভাবে সে-মানুষটা বসে নেই, তবে অন্য ভাবে আছে। আমি তোমায় খোলাখুলিই বলছি, আমাদের বিয়েটা আলাপ-পরিচয় করে হয়নি; আচমকাই হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবার কথা তুমি শুনেছ, বাবার খুব পছন্দ হয়ে যায় ভদ্রলোককে, রাতারাতি দু-একদিনের আলাপেই বাবা তার জামাই পছন্দ করে ফেলে। আমার বাবার স্বভাবই ছিল ওই-রকম, কখন কার ওপর তুষ্ট হবে বলা যেত না; আর তুষ্ট হলে তাকে মাথায় তুলতে বাবার চব্বিশ ঘণ্টাও যেত না। বাবার পছন্দতেই বিয়ে। সে প্রায় হুট করেই। তারপর আমি আমার স্বামীর কাছে চলে আসি। আমার বিয়ের মাস আষ্টেক পরে বাবা হার্টের রোগে মারা যায়।"

আবীর পায়ের ওপর পা রেখে জড়িয়ে বসল। নদীর দিক থেকে কনকনে বাতাস আসছে। অনেকটা তফাতে হাসির গলা পাওয়া গেল, কারা যেন বেড়াতে এসেছিল পার্কে—ফিরে যাচ্ছে, গানের গলা করে কে যেন গাইল: 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে…'

পরমা বলল, "স্বামীর বাড়িতে সংসার করতে এসে আমি আমার স্বামীকে ধীরে-ধীরে চিনতে পারলাম। সংসারে কিছু লোক থাকে

যারা কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকে। আমার স্বামী ছিল সেই রকম। তার কতদূর উচ্চাশা ছিল শুনলে তুমি কী ভাববে জানি না, অদ্ভুত ভাবতে পার, পাগল ভাবতে পার। দেখতাম, নিজের জন্যে সে অনবরত ভাবছে; সব সময় তার চিন্তা ছিল কী করে নিজেকে আরও প্রতিষ্ঠা করা যায়···”

“খুব অ্যামবিশাস ছিল ?” আবীর শুধলো।

পরমা মাথা হেঁট করে নাড়ল অল্প। “হ্যাঁ, আমার তাতে আপত্তি ছিল না। পুরুষ মানুষ বড় হবে, প্রতিষ্ঠা পাবে—এটাই তো সবাই চায়। বিশেষ করে সে যখন আমার স্বামী তখন তো আমি চাইবই তার মান-যশ-প্রতিষ্ঠা হোক।” বলে পরমা চুপ করে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরমা আবার যখন কথা বলতে শুরু করল, তার গলার স্বরও বদলে যেতে লাগল। পরমা বলল : “আমার স্বামী কলেজের মাস্টার ছিল। প্রফেসার। তোমায় আমি তা বলেছি। সাধারণ একটা কলেজে সে পড়াত। মফস্বলের কলেজে যে-লোকটা পড়ায়—তার সবটাই সাধারণ হবার মতন : অসাধারণ হবার তার কী থাকতে পারে বলো ? আমিও তাই ভাবতাম। তা ছাড়া ওর বয়স বেশি ছিল না। আমার চেয়ে সামান্য বড় ছিল—বছর দুয়েকের। এই বয়সে তার উচ্চাশা যতই থাক, সংসারের পাকা বুদ্ধি কোথায় পাবে ? মনে-মনে আমি এইসব ভাবতাম। ভাবতাম, পুরুষ হলেও তার বয়স কম, পুরুষ মানুষের বোধবুদ্ধি থিতিয়ে উঠতে দেরী হয়। এখন তার মাথায় অনেক রকম আসবে যাবে, বড়-বড় আশা স্বপ্ন এইসব দেখবে। তারপর আস্তে-আস্তে তার ছেলেমানুষী যাবে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলুম আমি যখন ভাবতাম তার সাংসারিক বুদ্ধি একেবারেই নেই তখন সে তার বুদ্ধির দৌলতে আমাকে সাত হাটে বেচে সাত বার কিনতে পারে। দেখলাম, তার বাস্তব বুদ্ধি ভীষণ। পাকা দাবা খেলুড়ের মতন সে পাঁচ-দশটা চাল আগে ভেবে নিত, তারপর দান ফেলত।”

পরমা থামল। থামার পরে মনে হল, তার ঠোঁট কাঁপছে

|তটা এখন আর সহ্য করা যাচ্ছে না। পৌষের ঠাণ্ডা ক্রমশই মুখ াক হাত পা অসাড় করে ফেলছিল।

আবীর বলল, "এখানে আর বসা যাবে না। চলো উঠি। ওদিকে একটা জায়গা আছে—"

পরমা সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবেই উঠে দাঁড়াল।

হাঁটতে-হাঁটতে পরমা বলল, "এই রকম দান ফেলে-ফেলে সে এগুচ্ছিল। দেখতে-দেখতে মানুষটা লোকের চোখে ভদ্র, উদার, াহানুভূতিশীল, দয়ালু, চরিত্রবান, সাহসী—আরও কত কী হয়ে গেল।" পরমার গলার স্বরে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ফুটল যেন। আবীর মুখ দেখার চেষ্টা করল পরমার, গাছের ছায়া অথবা জ্যোৎস্না আড়াল পড়ায় মুখ দেখা গেল না। পার্কের এই রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে খানিকটা, নেমে বাঁক নিয়েছে, বাঁকের মুখে ডান দিকে বালিয়াড়ির মতন উঁচু জমি, সবুজ ঘাসে ভরা। পথের একদিকে গোল কেয়ারির মধ্যে মরসুমী ফুল হিমে ভিজছিল।

আবীর অন্যমনস্ক হয়ে ইতস্তত করে বলল, "লোকের চোখে ভাল হওয়াটা অন্যায় কোথায়?"

"সবটাই অন্যায়—" পরমা জোর দিয়ে তিক্ত গলায় বলল। "এ বই রটনা। আমার স্বামীর এত গুণ ছিল না, কোনো ভাল গুণই ামি তার দেখিনি। সংসারে এটাই মজার, ঘরে যে চোর বাইরে নিজেকে সাধু বলে জাহির করতে পারে। এতে তার আটকায় ।···সমাজে আমার স্বামী সম্পর্কে যতই রটুক, আমি জানতাম কী ধরনের মানুষ। তোমায় বলেছি না, তার বাস্তব বুদ্ধি ভীষণ —, সত্যিই তাই। আমরা কতটুকু আর ভবিষ্যত ভেবে কাজ সে আমাদের দশগুণ ভেবে নিতে পারত। অঙ্ক করে-করে, -লোকসান খতিয়ে পাকা মাথায় সে এক-একটা করে চাল দিত। দেখতাম—সে প্রত্যেকটা চালেই জিতে যাচ্ছে। আমার গা ঘন করে উঠত। মানুষ এত বোকা! লোকটার চরিত্র ধরতে ছে না!···বাইরে তার যত সুনামই ছড়াক, ভেতরের কথা আমি

জানতাম। আমি জানতাম সে কেন সমাজের চোখে বড় হ'তে চাইছে, কেমন করেই বা হচ্ছে!...সে সব দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।" পরমা বোধ হয় ঘৃণার জন্যেই চুপ করে গেল।

কোনো রকম সাড়া শব্দ দিল না আবীর, পরমার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। তার মাথা ক্রমশই কেমন ভারী হয়ে আসছে ঠাণ্ডার জন্যে কি না বোঝা মুশকিল। ঢালু পথটুকু এই ভাবেই শেষ হল, কথাবার্তা আর বলল না কেউ।

বাঁকটা ঘুরে আসতেই সামান্য দূরে অল্পস্বল্প আলো-সাজানো চায়ের স্টলটা দেখা গেল। গোটা পার্কের মধ্যে ওই একটাই চায়ের দোকান; আরও একটা হবে নদীর দিকে। এই সময়টা—শীতের দিনে—দোকানটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, পার্কে বেড়াতে এসে নিতান্ত এক গ্লাস জল খেতে হলেও 'পার্ক কাফে'-তে না গিয়ে উপায় নেই। ছিমছাম দোকান, আস্তে-আস্তে সাজিয়ে তুলছে, চা-কফি-আইসক্রিম-কোকোকোলা-কেকটেক পাওয়া যায়, অল্প কয়েকটা বয়-বাবুর্চি খাটে; এখন পর্যন্ত বেশ পরিচ্ছন্ন রেখেছে দোকানটা।

আবীর দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "চলো, একটু চা খাওয়া যাক্; ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।"

পরমা আপত্তি করল না, কথাও বলল না।

আবীর আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, "তোমার স্বামী বাইরে ও-রকম হবার চেষ্টা করছিল কেন?"

পরমা আবীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। "কেন করছিল তুমি বুঝতে পারছ না?"

একেবারে না বুঝছে আবীর এমন নয়, তবু সে ভাল করে বুঝতে পারছে না। বলল, "না। সমাজে একটা স্ট্যাটাস পাওয়ার চেষ্টা টেষ্টা হবে আর কি! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"হ্যাঁ—ঠিক," পরমা বলল, "সমাজে মান-মর্যাদা পাওয়া। তবে আমার স্বামী অত বোকা ছিল না যে শুকনো মান-মর্যাদায় খুশি

হবে। লোকে তাকে ভাল বলল বলুক; কিন্তু সেই ভাল নিয়ে সে কী করবে যদি না তার ভালমানুষীটুকু নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়!···তার মাথায় ওই জিনিসটাই সবসময় কাজ করত, তার সুনাম, মান-মর্যাদা কী করে সে নিজের কাজে লাগাবে।" পরমা কথার মধ্যে থেমে গেল, নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। তার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের রূঢ়তা ফুটে উঠছিল, এই রূঢ়তা যেন কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ধিক্কার, প্রতিবাদ কিংবা প্রচণ্ড আক্রোশ। ওর গায়ের শাড়িতে জ্যোৎস্না পড়ে আরও শুভ্র দেখাচ্ছিল। খানিকটা পথ নীরবে পার হয়ে এসে পরমা আপন মনে কথা বলার মতন করে বলল: "নিজের ভেতরের নোঙরামি ঢেকে রাখার জন্যে, তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সে লোকের চোখে বড় হয়ে থাকতে চেয়েছিল। এ যে কত বড় ভণ্ডামি ভগবানই জানেন শুধু।"

চায়ের স্টলটার কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। নতুন টালির ছাউনি করা গোল মতন একটা ঘর, ঘরের সামনের দিকটা বেড় দিয়ে বারান্দা, বারান্দার রেলিং-টেলিংয়ে সিমেন্টের কারুকার্য করা জাফরি, কোথাও-কোথাও পুরু কাঁচ দিয়ে দোকান-সজ্জা করা হয়েছে। স্টলটার সামনে সবুজ ঘাসভরা মাঠ, ফুলের কেয়ারি। একটা মোটর বাইক দাঁড় করানো ছিল বাইরে।

আবীর পরমাকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল। দোকান ফাঁকা, এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসে-বসে কফিটফি খাচ্ছেন। বোধ হয় কারখানার কোনো মাঝারি অফিসার হবেন। বোঝাই গেল, মোটর বাইকটা তাঁর। সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছেন পার্কে। আবীরদের লক্ষ করার পর স্বামীস্ত্রী আবার নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন।

আবীর অনেকটা তফাতে একপাশে বসল, পাঞ্জাবী দম্পতি থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে।

"কফি খাবে?" আবীর জিজ্ঞেস করল।

"বলো।"

কফি আনতে বলে আবীর একটা সিগারেট ধরাল। পরমা তার মুখোমুখি বসে। কেমন আচ্ছন্নের মতন বসে আছে পরমা। চোখেমুখে তিক্ততা, হতাশা, ক্ষোভ। এই মুখ পরমার খুব স্বাভাবিক মুখ নয়। আবীর সিগারেট খেতে-খেতে বার-বার তাকে লক্ষ করছিল।

শেষে মৃদু গলায় আবীর বলল, "লোকটা জোচ্চোর ছিল? চিট্?"

নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল পরমা; কোনো জবাব দিল না।

আবীর আবার বলল, "তুমি বলতে চাও লোকটা তার সুনামগুলো ক্যাশ করেছে?"

পরমা এবার মুখ তুলে আবীরকে দেখল।

বড়-বড় দু গাল ধোঁয়া পর-পর গিলে ফেলে কী রকম বিষণ্ণ সুরে আবীর বলল, "একটা লোক এইভাবে চালাতে চাইল—আর চলে গেল, এটাই আশ্চর্যের! কেউ কিছু বুঝল না!"

বাঁকা করে ঘাড় তুলে পরমা বলল, "আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা এভাবে চালাতে চায় তারা চালাতে জানে, তোমার মতন বোকা তারা নয়।..." বলে পরমা বাঁ হাতটা গালে ছুঁইয়ে অন্যমনস্কভাবে আবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সামান্য পরে বলল, "তোমায় দু একটা ঘটনা বলি শোনো। কলেজের এক বুড়ো কেরানীবাবুর মেয়ের বিয়ে। পাঁচ ছ'টি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল নয়, এ হল সেজমেয়ে। তার অবস্থা বুঝে মেয়ের বিয়েতে কলেজের সবাই কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন। আমার স্বামী ভদ্রলোকের কাছে এটা একটা সুযোগ হল—তখনও সে নতুন তো, কলেজের মাস্টার কেরানীদের মধ্যে দাতা কর্ণ সাজবার জন্যে সে বুড়ো কেরানীকে আড়ালে ডেকে বলল, মেয়ের বিয়েতে সে একটা গলার হার গড়িয়ে দেবে। কেরানীবাবু তো কেঁদেকেটে হাত পা জড়িয়ে ধরলেন, কৃতার্থ হলেন। কথাটা তখন যেন জানাজানি না হয় তার জন্যে বারবার সাবধান করে দিল ও। এসব কিন্তু গোপনে

াপনে হয়েছিল ; আমি বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। পরে শুনেছি।
··তারপর একদিন দেখি, আমার গয়নার বাক্সে একটা সরু মতন
ার নেই। ওটা আমার কিশোরী বয়সের হার ছিল গলার, মা
রিয়ে দিয়েছিল। মার স্মৃতি হিসেবেই রেখে দিয়েছিলাম কতদিন
রে। খোঁজাখুঁজি করে হার না পেয়ে বুঝলাম, হারটা দান করা
য়েছে। বললাম: 'তুমি আমার মার দেওয়া হার চুরি করে
করানীবাবুর মেয়ের বিয়েতে দিয়েছো ? আমায় বলোনি কেন ? চাওনি
কন ?' তার জবাবে ও কী বলল জানো ? বলল : 'তোমার দেড়
রির হারটা বাক্সে পড়েছিল—কোনো কাজে আসছিল না। হারটা
অন্য জায়গায় দিয়ে আমার সুবিধে হয়েছে, কেরানীবেটা আমার
পাষা চাকর হয়ে গেছে, কলেজে সুনাম হয়েছে আমার, রেসপেক্ট
বেড়েছে।···' শুনে বললাম, 'তোমার জয়গান গাইছে বুঝি ?' বলল,
আজকাল সহজে লোকে জয়গান গায় না, গাইয়ে নিতে হয়। তার
জন্যে শিক্ষার দরকার ; ও তুমি বুঝবে না। বুড়ো কেরানীকে দিয়ে
আমি কলেজের সমস্ত কেরানী, চাকরবাকর থেকে টিচার্সদের মধ্যে
কথাটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, মায় প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত জেনেছে। তুমিও তো
জেনে ফেলেছ, দেখছি—; তা হলেই বোঝো—'।"

কফির পেয়ালা এসে গিয়েছিল, পরমা চুপ করল।

আবীর এ-রকম কাহিনী আর শোনেনি। অবাক হচ্ছিল যতটা
তার বেশী ক্রুদ্ধ হচ্ছিল। কফির পেয়ালা রেখে মাঝবয়সী লোকটা
চলে গেলে উত্তেজিত গলায় আবীর বলল, "সাঙ্ঘাতিক তো। পাকা
শয়তান···।"

পরমা বলল, "এ তো খুবই মামুলী ব্যাপার। এ-রকম অনেক
আছে। একবার কলেজে একটা লোক এসেছিল ম্যাজিকের খেলা
দেখাতে। ছেলেমেয়েরা উদ্যোগ-আয়োজন করে তার খেলা দেখল।
খেলা দেখানোর পর লোকটা হঠাৎ রক্তবমি করে বসল। সবাই
তটস্থ, কী করবে তাকে নিয়ে। আমার স্বামী তাকে বাড়িতে এনে
তুলল, ডাক্তারটাক্তার এসে দেখল। দিন তিনেক পরে লোকটা চলে

গেল সুস্থ হয়ে। তেমন মারাত্মক কিছু না। গলার রোগ থে
হয়েছিল। পরে শুনলাম, সারা শহর জেনে গেছে লোকটা য
রোগী, আগেও ক'বার রক্ত উঠেছে মুখ থেকে। আমার স্বা
অজানা, অচেনা এক যক্ষ্মা রোগীকে বাড়ি বয়ে এনে কলসি-কলসি র
পরিষ্কার করেছে—এটা রটে যাবার পর তার খ্যাতি কোন্ চূড়া
উঠল বুঝতেই পার। সে কিন্তু লোকটাকে এনেছিল মাত্র, তা
কাছে ঘেঁষে নি। অথচ লোকটা চলে যাবার পরই রটনাটা কেম
গুছিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল। শুনে আমি বলেছিলাম: 'ওর ে
শুনলাম যক্ষ্মা নয়।' আমার স্বামী বলল: 'তোমার শোনা নি
মাথা ঘামিও না। আমি বলেছি, লোকটা নিজেই বলেছে তার যক্ষ্
চার বছরেরও বেশী ভুগছে। এর ওপর কোনো কথা নেই। আমা
সুবিধের জন্যে তার যক্ষ্মা হওয়া দরকার ছিল। ব্যাস্…।"

আবীর কফি খাচ্ছিল। পাঞ্জাবী দম্পতি উঠে গেছে। মোট
বাইকটাও শব্দ করে চলে গেল। আশ্চর্য! এই পরমার স্বামী
শালা পয়লা নম্বরের শয়তান। ডেনজারাস। আবীরের কপা
জ্বালা করছিল।

পরমা বোধ হয় ক্লান্ত বোধ করছিল। মুখ নামিয়ে কফি খে
লাগল।

আবীর আবার একটা সিগারেট ধরাল। সে বুঝতে পারছে
পরমার স্বামী ধুরন্ধর ছিল, এক একটা সুযোগ বেছে নিয়ে কাজে
লাগিয়েছে, তার ওপর ভাল-ভাল ধারণা গড়িয়ে নিয়েছে, নি
সেগুলো ক্যাশ করেছে।

খানিকটা কফি খেয়ে পরমা বলল, "বাইরে তার চেহা
যতই দেবতার মতন হয়ে উঠুক বাড়িতে আমি দেখতাম সে কতব
পশু। সে মোটেই উদার-টুদার ছিল না; দয়ালু, সহানুভূতিশীল ছি
না। তার সাহস ছিল না, চরিত্র ছিল না। ছেলেমেয়েদের হাতে
রাখতে হবে, তাদের পছন্দসই হতে হবে বলে সে নানাভাবে বিস্ত
খরচ করত, কাউকে বই কিনে দিত, কারও মাইনে দিয়ে দিত

একদিকে দিত, অন্যদিকে বাড়িতে আমার কাছে এদের চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিত, বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কথা বলত। অদ্ভুত।"

কথার মধ্যে সামান্য থেমে আবার এক চুমুক কফি খেয়ে নিল পরমা। বলল, "কারও অসুখ শুনলে দশবার করে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে, ছেলেদের হোস্টেলে বসন্ত হল—জল বসন্ত—সকাল বিকেল তাদের তদারকি করতে যেত, আর বাড়িতে এসে জলে লিস্টারিন ঢেলে কার্বলিক সাবান দিয়ে স্নান করত এবেলা-ওবেলা; অসুস্থ ছেলে-গুলোকে আড়ালে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করত। বাইরে সে যা করত—তাকে সওদা করা বলে। বাড়িতে এসে হিসেব করে দেখত—কতটা কেনা হল। তুমি বিশ্বাস করো আর না করো আমি জানি এই জগতে বুদ্ধি খরচ করে কিনলে এসবও কেনা যায়।"

আবীর অকারণে হাসির মতন শব্দ করল, যেন কথাটা শুনতে তার ভালই লাগছে। বলল, "তোমার স্বামী কিনেছিল?"

"হ্যাঁ, আমরা যেমন সোনার গয়না কিনি, জড়োয়া কিনি—সেই রকম করে কিনেছিল।" পরমা বলল, "কিনতে-কিনতে সে কী না হয়ে যাচ্ছিল—ছেলেমেয়েদের মাথার মণি, সমাজের আদর্শ, ভদ্র মানুষ, সৎ, বিবেচক ব্যক্তি।…অথচ তলায়-তলায় সে তার কেনা পুঁজির জোরে সামনের কাঁটা একটা-একটা করে তুলে ফেলছিল। প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না কারও, কেননা, তার মূর্তি তখন বিস্তর বড় হয়ে গেছে, পেছনে তার অনেক যোগানদার।" পরমা থেমে গেল।

কফি শেষ করে আবীর নিবে যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে নতুন করে একটা ধরাল।

মাথায় শাল এবার অনেকটা টেনে কান চাপা দিয়ে পরমা বলল, "তার ক্ষমতার ওপর লোভ ছিল, সে তার সহকর্মীদের পেছনে ফেলে, সকলকে ডিঙিয়ে মাথায় উঠতে চেয়েছিল। তা উঠুক। আস্তে-আস্তে সে অনেক কাঁটা সরিয়েছে, সমাজে নামডাক করে ফেলেছে; এবার সে শেষের দিকের কাঁটা সরাতে চাইল। আমি এতদূর পর্যন্ত সহ্য

করেছিলাম। কিন্তু ওরই কলেজের আর একজন—বিকাশকে যেদিন ও নোঙরা করতে চাইল সেদিন আর আমার সহ্য হল না। বিকাশের নামে ও অনর্থক কুৎসা রটাতে শুরু করেছে দেখে আমি বললাম, 'এ তুমি কী করছ? এটা অন্যায়।'···ও বলল, 'মানুষকে সরাসরি খুন করা আইনের চোখে অন্যায়, কিন্তু আজকাল একটা সামাজিক খুন বেরিয়েছে—ক্যারেকটার অ্যাসিসেনেশান, এটা অন্যায় নয়। বিকাশকে আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ করছি, ও ওর চরিত্র দিয়ে, মানে যাকে তোমরা চরিত্রগুণ বলো—তাই দিয়ে কিছু পেয়ে যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া যায় না। ওর আসল জায়গায় ঘা মারতে হবে'।"

আবীর অস্ফুট শব্দ করল। "যাঃ!"

পরমা বলল, "যা নয়, এটাই সত্যি।···শেষ পর্যন্ত আমার স্বামী চেয়েছিল বিকাশের চরিত্রকে শেষ ঘা দেবার জন্যে আমি যেন একদিনের জন্যে একটু সাহায্য করি। নিষ্পাপ বিকাশের চরিত্রে ও কলঙ্কের ছিটে দিতে চেয়েছিল। আর সেই নোঙরা কাজ দিয়েছিল আমার ঘাড়ে—তার স্ত্রীকে।··· যাক, সে-সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই!···সেদিন আমায় বেছে নিতে হয়েছিল—আমি কাকে সাহায্য করব? স্বামীকে না বিকাশকে?···আমি কাকে করেছি বলতে পার?"

আবীর আচমকা যেন প্রচণ্ড শীতে কেঁপে উঠে বলল, "বিকাশকে।"

পরমা কিছু বলল না। নীরব, নিঃসাড় হয়ে বসে থাকল।

কতটা সময় বয়ে গেল কেউ বুঝি অনুভব করতে পারছিল না। শেষে শীতের নিশীথ বাতাসের দমকায় গাছপাতা কেঁপে-কেঁপে শব্দ করতে থাকলে, এবং পরমা ও আবীর ঠকঠক করে কেঁপে উঠলে, আবীর উঠে দাঁড়াল, বলল, "আর না, চলো।"

পরমাও অত্যন্ত ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে তাকে আশ্চর্য নিঃস্ব, করুণ দেখাচ্ছিল।

কাফে থেকে বেরিয়ে আবার মাঠ, সেই জ্যোৎস্না, পৌষের

বাতাস, পার্কের নতুন রাস্তা। পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে, কথা বলছে না; তারা একত্র থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন। যে যার চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে পথ হেঁটে যাচ্ছিল। অনেকটা এগিয়ে আসার পর আবীর বলল, "বিকাশই তোমার স্বামীকে মারল?"

"হ্যাঁ—, না—" পরমা গভীর অন্যমনস্কতার মধ্যে যেন সচেতন হল, "না, বিকাশ মারে নি। আমিই মেরেছি।"

"তুমি?" আবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার গলার শব্দটা কিম্ভুত শোনাল, থরথর করে পা কাঁপল।

পরমা বলল, "হ্যাঁ, আমি। কিন্তু এমন করে মারলাম যাতে ওর পক্ষে—আমার স্বামীর পক্ষে—এতদিনের কেনা ভুয়ো দেবত্ব বাঁচাতে আত্মহত্যা না করে উপায় থাকল না।"

আবীর অবাক হল। "তাহলে খুন নয়, আত্মহত্যা।"

"হ্যাঁ, আত্মহত্যা।"

১১

পার্কের প্রায় শেষাশেষি এসে আবীর পরমার মুখ দেখল আর-একবার। মাথায় শালের ঘোমটা, শালের তলায় পরমার চাপা ফরসা রঙের মুখটুকু পাথরের মতন শক্ত হয়ে আছে, চাঁদের আলো প্রায় সরাসরি তার মুখে পড়ছে। আবীর মুখ নীচু করে নিল। হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ সে কোনো কথাবার্তা বলে নি, বলার ইচ্ছেও হয় নি। পরমাও নীবব। তার যা বলার সবই যেন বলা হয়ে যাওয়ায় এখন তার মধ্যে শূন্যতা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। সে ক্লান্ত। ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক, কতক্ষণ ধরে নিরবচ্ছিন্ন সে শুধু কথা বলে গেছে, এবং বলার সময় তার কখনো উত্তেজনা, কখনো ক্রোধ, ক্ষোভ, বিরক্তি, তিক্ততা এসেছে ; ফলে তার স্নায়ু একেবারেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়ত পরমা নীরব থেকে শ্রান্তি দূর করছিল।

আবীরও কথা বলছে না। বলার আগ্রহ বোধ করছে না। সে পরমার স্বামীর কথা ভাবছিল। মুখে শুনে কোনো মানুষকেই ষোলো আনা বোঝা যায় না। আবীর তা বুঝতেও চায় না। তবে আজ সে পরমার স্বামীকে দশ আনা বুঝতে পারছে। লোকটা ভাল ছিল না। শুধু ভাল ছিল না বললে কিছুই বলা হয় না—আরও বলা দরকার। পরমার স্বামী বদমাশ টাইপের লোক ছিল, পাক্কা শয়তান, ধুরন্ধর, পাজী। পরমার জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে বিয়েটা হয়ে গেলেও, আবীর বুঝতেই পারছে, ওরা স্বামী-স্ত্রী একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ ছিল। একজন পুরোপুরি সেলফিশ, অ্যামবিসাস, চতুর, খচ্চর টাইপের, নোঙরা লোক। পরমা মোটেই এ-রকম নয় ; তার বোধবুদ্ধি, মন, রুচি, আশা, আকাঙ্ক্ষা

থেকে পরমাকে খারাপ বলা যাবে না। বেচারীকে বাধ্য হয়ে সব সহ্য করতে হয়েছে।

একপাশে পার্কের নতুন ফেন্সিংয়ের কাজ হচ্ছে। কিছু ধারালো শিক পড়ে আছে টাল হয়ে। অন্যমনস্কভাবে তাকাতে জিনিসগুলো আবীরের চোখে পড়ল। বর্শার মতন ধাবালো শিকগুলো চাঁদের আলোর বেশ চকচক করছে। শিকগুলো একেবারেই নতুন, কাজের জন্যে জমা হয়েছে, কাজ চলছে কাছাকাছি কোথাও। পার্কের রেলিংয়ে বসানো হবে। ছোট ছোট দেড়-দু হাত লম্বা শিকগুলোর মুখের দিকটা ছুঁচলো হয়ে আছে। ফলার মতন।

পরমা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাতাসে হোক, অথবা অন্য কোনো কারণে হোক, তার শাড়ি কিছুটা অগোছালো হয়ে পড়ায়, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে পায়ের দিকে শাড়ি গুছিয়ে নিচ্ছিল। মাথায় শালের ঘোমটাটাও ঠিক করে নিল।

আবীর হাত কয়েক এগিয়ে থেমে গিয়ে পরমাকে আবার দেখল। এখন আর আলো পড়ছিল না মুখে, চাঁদের দিকে পিঠ পড়ে যাওয়ায় মুখ অন্ধকার দেখাচ্ছিল পরমার। আবীরের চোখে এই মুখ আচমকা খুব রহস্যময় বলে মনে হল। পরমা তার স্বামীর আত্মহত্যার কারণ হয়েছে। কেন? আগে শোনা গিয়েছিল পরমার স্বামী হাঙ্গামায় জড়িয়ে মারা গেছে। কথাটা মিথ্যে। ওর স্বামী আত্মহত্যা করেছিল। নিতান্তই ঘরের কথা প্রকাশ করতে চায় না বলেই কি পরমা মিথ্যে বলত? নাকি পরমা সত্য বলার সাহস পেত না? কেন সাহস পেত না? বিকাশকে সাহায্য করার জন্যে পরমার অত আগ্রহ কেন হল?

বাতাসে খানিকটা সুরকির গন্ধের সঙ্গে যেন জমানো লোহা-লক্কড়ের কেমন এক গন্ধ ভেসে এল আবীরের নাকে। আর ঠিক তখন, কানে-কানে বলার মতন কে যেন আবীরের মনে নিঃশব্দে বলল: 'তুমি ওকে বিশ্বাস করো না। কী করে ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পার? যে স্বামীর সে আজ হাজার নিন্দে করল, সেই স্বামীর সঙ্গে ও দু-তিন-

চার মাস নয়—ত্থ-আড়াই বছর ঘর করেছে। এই স্বামী যদি এত মন্দ, অসহ্য তবে সে কেন স্বামী ত্যাগ করে চলে এল না? কেন সে সেই সংসারে থেকে গেল? আর কেনই বা অন্য একজনের সম্মান বাঁচাতে সে নিজের স্বামীকে এমন অবস্থায় ফেলল যাতে তার স্বামী আত্মহত্যা করল? সত্যিই কি আত্মহত্যা? খুন নয় তো? এই পরমা—তোমায় বলেছে আবীর, প্রথম দিন তোমায় জলবৃষ্টির মধ্যে পথে দেখার পর সে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে এসে সারারাত ভয়ে উৎকণ্ঠায় মরেছে, পাছে তার মৃত স্বামী এসে পড়ে। কেন? মনের এই ভয় কেন? কোন্ পাপের ভয়? পরমা নিষ্পাপ এ-কথা তোমায় কে বলল?'

আবীর বুঝতে পারছিল না, কিন্তু তার সমস্ত বোধের মধ্যে কেমন এক ওলটপালট হয়ে গেল, কে যেন চোখের পলকে সাদা পিঠটা ঘুরিয়ে উলটো করে দিল—কালো হয়ে গেল। ওই পরমা তোমার শত্রু। বড় শত্রু।

আবীর আচমকা অদ্ভুত ভীষণ এক ক্রোধ ও আতঙ্ক বোধ করল। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাও? আমি তোমার স্বামী নই, সেই ছোট লোক, শুয়ারের বাচ্চা আমি নয়। তোমার পাপের সঙ্গে আমাকে জড়াবে না। নেভার। জড়াতে চাইলে আমি তোমায় মেরে ফেলব।

খুবই আশ্চর্য যে, আবীর এখন সত্যি সত্যিই ভাবল : সে এখানে এই নির্জন, স্তব্ধ, জনমানবহীন জায়গায় পরমাকে অনায়াসেই খুন করতে পারে। একটা শিক তুলে নিলেই যথেষ্ট।

কিন্তু কেন সে খুন করবে? কেন? কেন? আবীরই কি পরমার সেই স্বামী? না, না, না।

আবীর কি কিছুর শোধ নিতে চাইছে? কিসের? তবে কি এই আবীরের তলায় পরমার মৃত স্বামী আশ্রয় নিয়ে রয়েছে? অথবা আবীরই কোনো সময়ে পরমার স্বামী ছিল!

জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল আবীর। না, না, কখনো নয়।

পরমাকে কেন আবীর খুন করবে বুঝতে পারল না। অথচ পরমার ওপর তার প্রবল, অজ্ঞাত এক ঘৃণা হচ্ছিল।

পার্কের বড় ফটকের কাছাকাছি এসে পরমা কিছু বলল অস্পষ্ট করে। পরমার গলার স্বর আবীরের কানে গেল, কথাটা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না, মুখ তুলে পরমাকে দেখল, তারপর ফটকের দিকে তাকাল। কয়েক পলক ফটকের দু পাশের থামের মাথায় জ্বলা বাহারী, আড়াল-করা আলোর দিকে তাকিয়ে তার স্থান-কাল সম্পর্কে চেতনা স্পষ্ট করে ফিরে এল। ফটকের দুপাশে ঝাউয়ের কুঞ্জ, কয়েকটা ইউকেলিপটাসের দীর্ঘ মাথা জ্যোৎস্না ও হিমে অদৃশ্য হয়ে এসেছে যেন। ফুলের গন্ধও অনুভব করতে পারল আবীর। কিছুক্ষণ আগে তার কী হয়েছিল কে জানে! আবীর তার নিজের হাত পা শরীর মাথা—সব নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল, তবু হঠাৎ সে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, এই আবীর আর ছিল না। সে পরমাকে ঘৃণা করেছিল, পরমার প্রতি তার বিতৃষ্ণা এবং আক্রোশ এসেছিল। খুব নির্মম, নিষ্ঠুর, হিংস্র হয়ে পড়েছিল আবীর, পরমাকে খুন করার চিন্তা এসে গিয়েছিল। কেন এ-রকম হল কে জানে! হয়ত সামান্য সময়ের জন্যে আবীরের মধ্যে কোনো বিকার বা বিকৃতি এসেছিল, সে তার কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল। এখন আবীরের অনুশোচনা হচ্ছে, দুঃখ বোধ করছে। আবীর আবার পরমার মুখ দেখল।

আবীর বলতে পারল না : পরমা, সামান্য আগে আমি তোমায় খুন করতে চেয়েছিলাম। তোমায় আমার খারাপ লেগেছিল, বিশ্বাস হচ্ছিল না তোমাকে। আমি তোমার স্বামীর মতন শয়তান হয়ে যাচ্ছিলাম!

আবীর আচমকা পরমার হাত ধরে ফেলল। হাত ধরার পর সে আকর্ষণ করল পরমাকে, তার কব্জি শক্ত, হাতের মুঠো কঠিন; যেন পরমাকে সে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে ধরে ফেলেছে, ফেলে কাছে টেনে

নিচ্ছে। পরমার চোখে চোখ রাখতে পারল না আবীর, পরমার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটল, অথবা আগ্রহ, তার চোখ শান্ত কোমল হয়ে থাকল অথবা চঞ্চল হল আবীর লক্ষ করতে চাইল না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল না, আবীর পরমার দিকে আরও ঘন হয়ে, নত হয়ে দৃঢ় হাতে পরমার কণ্ঠ বেষ্টন করল। আলিঙ্গনের মধ্যে যে উত্তেজনা ও দৃঢ়তা ছিল তাতে মনে হতে পারে—অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আবীর যেন পরমাকে কিছু জানাতে চায়। কিছু বলল না আবীর। নিজের কাঁধ আরও একটু নুইয়ে মুখ নীচু করে পরমার মুখে নামিয়ে আনল। পরমা বিন্দুমাত্র নড়ল না, কাঁপল না, শুধু চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। চুম্বন বুঝি কিছু দীর্ঘ হল, এত দীর্ঘ যে একটা পতঙ্গ অন্ধকারে আবীরের কানের পাশে উড়ে এসে না পড়লে সে বুঝতেই পারত না—পরমার ওষ্ঠে আর স্বাদ নেই।

ফটকের বাইরে কোনো রিকশা ছিল না। কোম্পানীর উর্দিপরা পাহারাদার দুজন এবং বাগানের মালিঘরের একজন ছাড়া কাউকে আর দেখাও গেল না। সামান্য এগিয়ে রিভার ট্র্যান্সপোর্টের ছোট একটা গ্যারেজ, বালির লরিটরি দাঁড়িয়ে থাকে, অল্পস্বল্প কাজ হয় গাড়ির, শেডের তলায় একটা চায়ের দোকান আছে, মিস্ত্রীমজুরে চা-টা খায়। ওখানে এখনও দু একটা রিকশা থাকার কথা। শীতের দিনে আগুন পোয়াচ্ছে হয়ত।

ওদিকে রিকশা না পেলে বেশ কিছুটা হাঁটতে হবে, পুরোনো কাছারির মোড় পর্যন্ত, তার আগে আর রিকশা পাওয়া যাবে না। পার্কে বেড়ানোর পক্ষে এই শীতের দিনে রাত একটু বেশিই হয়ে গেছে। আবীর অস্বস্তির গলায় বলল, "চলো, ওই গ্যারেজের কাছটায় দেখি। ওখানে রিকশা পাওয়া যেতে পারে।"

পরমা কিছু বলল না।

সামান্য হেঁটে এসে গ্যারেজের কাছে রিকশা পাওয়া গেল। মাত্র একটিই ছিল, অন্যটা একটু আগে চলে গেছে।

পরমাকে রিকশায় উঠিয়ে আবীর নিজে উঠল। রিকশা চলতে শুরু করল।

সামনেই ঢালু পথ, সোজা নেমে গেছে। দু পাশে মাঠ আর প্রান্তর, কোথাও-কোথাও খেত খামার। হিম-কুয়াশায় শূন্য যেন জমাট হয়ে আছে, চাঁদের আলোও কোনো কিছুকে স্পষ্ট করতে পারছে না। সাইকেল রিকশাটা হুহু করে নেমে যাচ্ছিল, রিকশাওলার কান-মাথা সুতির চাদরে জড়ানো, গায়ে পুরোনো মিলিটারি সোয়েটার, পরনে পাজামা। চতুর্দিক নির্জন। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। উত্তরের দিকে, দূরে কারখানার আলো জ্বলছে মিটমিট করে।

আবীর সামনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। পিচের মসৃণ রাস্তায় রিকশা ছুটে যাওয়ার শব্দটা তার কানে অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

এক সময় পরমা আবীরের একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল। চাপা গলায় বলল, "আমার স্বামীর জন্যে আমার কোন মমতা নেই।"

আবীর সাড়া দিল না।

পরমা নিশ্বাস ফেলল, তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আবীর শুনতে পেল। পরমা বলল, "তার স্মৃতি রাখার মতন নয়। আমিও রাখতে চাই না। তবু আমার জীবনে যা ঘটে গেছে তাকে ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। সেটা থেকে যায়। যায় না?"

হ্যাঁ বা না বোঝা গেল না, আবীর কেমন এক শব্দ করল গলায়।

আরও কিছু অপেক্ষা করে পরমা দ্বিধার গলায় বলল, "আমার স্বামীর কথা তোমাকে বলতেও আমার ঘেন্না হত। আমি চাই নি এই নোঙরামিটা তোমায় বলি। অথচ বলতেই হত একদিন। নিজের জন্যেও বলতে হত।" পরমা আবীরের হাত নিজের গালের কাছে তুলে নিল, নিয়ে নিজের গালে ছুঁইয়ে রাখল। ঠাণ্ডা কনকন করছিল পরমার মুখ।

ঢালু পথ শেষ হয়েছে, এবার খানিকটা সমতল জায়গা, দুপাশে খাঁ খাঁ মাঠ, কোথাও কোনো বিরাট অশ্বত্থ বা তেঁতুল গাছের তলায়

অন্ধকার ঝোপ হয়ে বসে আছে যেন। পৌষের বাতাস আরও ধারালো হয়ে উঠছিল।

কাছাকাছি কোথাও একটা শব্দ শোনা গেল। কিছু দেখা গেল না। রিকশাটা মাঝারিভাবে চলছে। উলটো মুখ থেকে আলো লাফিয়ে উঠল। গাড়ির আলো। দেখতে দেখতে আলোটা বেঁকে পুবের দিকে চলে গেল। আবীর পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল, পরমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। দেশলাইটা পাওয়া গেল না। পার্কের কাফেতে ফেলে এসেছে। পুরোনো কাছারির মোড় এল, এক-আধটা দোকান, সামান্য আলো, খোলার চালের ঘর কয়েকটা, বনতুলসীর ভরাট গন্ধ। আবীর কিছুই লক্ষ করল না।

সমতল জায়গাটা প্রায় শেষ হল, সামনে চড়াই। আবীর ক্রমেই কেমন বিষণ্ণ, অবসন্ন হয়ে এসেছিল। অনেকক্ষণ থেকে সে অন্যমনস্ক। এই অন্যমনস্কতা গভীর হতে হতে তার চেতনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চোখ চেয়েও আবীর কিছু দেখছিল না, তন্দ্রার মধ্যে ফিকে স্বপ্নের দৃশ্যের মতন চলে যাচ্ছিল।

তার কোথায় যে কী হয়ে যাচ্ছে আবীর বুঝতে পারছিল না। অথচ তার অনুভূতির তলায় আশ্চর্যভাবে কিছু হয়ে যাচ্ছে। যেন আবীরের হৃদয় বা মনের কোথাও অনেকক্ষণ থেকে কারা নিঃশব্দে কিছু খুঁড়ে যাচ্ছে। এটা খুব স্বস্তিজনক নয়, তবু বাধা দেবার উপায় আবীরের নেই। সে কোনো আঘাতও পাচ্ছিল না, তাকে খুব চমৎকারভাবে অজ্ঞান করে এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হচ্ছে।

আবীর ঘুম পাওয়ার মতন চোখের পাতা বন্ধ করল, অলসভাবে; খুলল, আবার বন্ধ করল।

চড়াইয়ে ওঠার সময় রিকশাটা আস্তে আস্তে উঠছে। প্যাডেলের একটা শব্দ হচ্ছিল, যেন কোথাও আটকে গিয়ে লেগে যাচ্ছে। আবীর পিঠ আরও হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকল। অল্প পরেই চোখ খুলল, পেছনে একটা শব্দ হচ্ছে। কিছু আসছে যেন। মুখ ফিরিয়ে দেখার উপায় নেই। আবীর মুখ ফেরাতে পারল না।

কনকনে, ঠাণ্ডা, ধারালো হাওয়া আবীরের মুখের ওপর ঝাপটা দিয়ে গেল। শীতে কেঁপে উঠল আবীর। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল।

আচমকা রিকশার পাশ দিয়ে একটা মোষ খ্যাপার মতন ছুটতে-ছুটতে চলে গেল। চাঁদের অপরিষ্কার আলোয় ছুটন্ত মোষটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, তার ডাক কেমন ভীতিকর শোনাল।

চড়াইটা শেষ হয়েছে। রিকশাঅলা শেষ কয়েকবার শরীর দুলিয়ে প্যাডেল মেরে পিঠ সোজা করল। ধীরে-ধীরে রিকশাটা গড়াতে লাগল। আবীরের শীত করছিল, হাত দুটো কোটের পকেটে পুরে, গা হাত পা গুটিয়ে সামান্য আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল।

এখন তারা কারখানার সীমানায় এসে পড়েছে, বাঁ দিকে কারখানা, অনেকটা তফাতে; সোজা গিয়ে ডান দিকের পথ ধরলে তারা শহরের দিকে যাবে। এখানে কুয়াশার ভাব বেশী, কারখানার ধোঁয়ার জন্যেই বোধ হয় আরও ঝাপসা লাগে। টিমটিমে একটা দোকান পেরিয়ে গেল, দু চারটে কুলিব্যারাক, কয়লার পাঁজা জ্বলছে, বিশ্রী ধোঁয়া আর কয়লা-পোড়া গন্ধ।

আচমকা আবীরের মনে হল, সেই খ্যাপা মোষটা আবার রিকশার পিছু-পিছু আসছে। হতে পারে জন্তুটা কুলিব্যারাকের কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আবার ছুটতে শুরু করেছে।

শব্দটা আসছিল, হঠাৎ থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার।

কিছুই নয়, যেন নিজেকেই এই সময় খানিকটা কৌতুক করার জন্যে আবীর মনে-মনে বলল: পরমার স্বামী আসছে। সেই জন্তুটা।

অসম্ভব জেনেও এই চিন্তাটা তার ভাল লাগল, কৌতূহল-জনক মনে হল। পরমার স্বামীকে যদি আর-একবার বাঁচিয়ে তোলা যেত কী হত? নিশ্চয় ওই খ্যাপা মোষটার মতন আবীরদের তাড়া করত। করত না? নিশ্চয় করত। করা স্বাভাবিক। আবীর তার বউকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরমার ওপরও লোকটার প্রসন্ন থাকার কথা নয়, পরমার জন্যেই তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে।

বলা যায় না, সে এখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পরমাকে খুন করতে পারে, আবীরকেও।

আবীর হাসির মতন শব্দ করল, গলা জড়িয়ে যাওয়ায় হাসিটা অন্য রকম শোনাল।

পরমা বলল, "কী হল?"

"না, কিছু না।"

"কেমন যেন করলে?"

"এমনি।"

মুখের কাছে হাত এনে পরমা কাশির শব্দ করল: "সেই তখন থেকে তুমি কী ভাবছ?"

আবীর জবাব দেবার আগে অপেক্ষা করল সামান্য, বলল, "কী জানি!"

পরমা কিছু যেন সন্দেহ করে বলল, "তোমার কি আরও কিছু জানার আছে?"

"না, না; আর কী—!"

"জানার থাকলে বলতে পার।"

আবীরের মনে হল না, সাধারণ ভাবে সে আর কিছু জানতে চাইতে পারে। মোটামুটি তার সবই জানা হয়ে গেছে।

দেখতে-দেখতে রিকশাটা সেই বড় মোড়ের কাছে এসে গেল। বাঁ-হাতি শহরের রাস্তা, রেলের ব্রিজের ওপারেই। এখানেই দোকানপসার রয়েছে কিছু, একটা বাস লোক তুলছে, টিনের শেডের তলায় কিছু রিকশা, কাঠখড় পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রিকশাঅলারা আগুন পোয়াচ্ছে।

রেল ব্রিজের মাথায় উঠে রিকশাটা হুশ্ করে নেমে গেল। ব্রিজের তলা দিয়ে মালগাড়ি চলে যাচ্ছিল।

আচমকা, একেবারেই আচমকা আবীর বলল, "তুমি প্রথমদিন—আমায় যেদিন প্রথম দেখলে—তোমার স্বামী বলে ভুল করেছিলে। তাই না?"

"হ্যাঁ—।" পুরোনো কথাটা নতুন করে শুনলে মানুষ যতটুকু অবাক হয় পরমা ততটুকু অবাক হল। "কেন ?"

"মিল দেখে ?"

"চেহারায় খুব মিল।"

"স্বভাবে নয় ?"

"না ; একেবারে উলটো।"

"কী করে তুমি বুঝলে ?"

পরমা অবাক হয়ে বলল, "বাঃ, বুঝব না।"

আবীর আর কিছু বলল না। পরমার এই ধারণা ভাল, তবু আবীরের মনে হল, এটা ঠিক নয়। মানুষের স্বভাব চেহারা নয় যে সেটা চোখে দেখা যায়, বোঝা যায়। পরমা জানে না, খানিকটা আগে—পার্কের মধ্যে আবীর একসময় ঘৃণা এবং ক্রোধে পরমাকে খুন করার কথা ভেবেছিল। অকস্মাৎ এই রকম প্রবৃত্তি তার এসেছিল। কেন এসেছিল আবীর জানে না, হয়ত তার অজ্ঞাত চেতনা থেকে আদিম কোনো হিংস্রতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। বা এমনও হতে পারে, আবীর সেই মুহূর্তে নিজের কোনো গোপন পাপকে অনুভব করেছিল। কে জোর করে বলতে পারে, আবীর পরমার মৃত স্বামী হয়ে যাবে না! কিংবা এই আবীরই পরমার স্বামীর অন্য কোনো রূপ নয়। সেটা শয়তানের চেহারা ছিল, এটা মোটামুটি সভ্য চেহারা, সমাজে চলনসই। টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ হয়ত।

চিন্তাটা কোন্ ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মতন মাথায় ঢুকে জমে-জমে বসতে যাচ্ছিল, আবীর তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সেটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করল। আরে যাঃ, সে কী পাগলের মতন যা তা ভাবছে! সে পরমার স্বামী নয় ; ওই লোকটার মতন চতুর, স্বার্থপর, বুদ্ধিমান, অ্যামবিসাস, শয়তান নয়। আমি অন্যরকম, পুরোপুরি অন্য : আমার কোনো চতুরতা নেই, আমি বোকা বুদ্ধু, আমার কোনো অ্যামবিসান নেই, কেউ বলবে না আমি শয়তান। আমি

সংসারে এমন কিছু পেতে চাই না, করতে চাই না—যাতে আমার বিবেক দাঁত বের করে হেসে-হেসে বলে : এই তো শালা আবীর, দিব্যি খেললে! বাঃ, বাহা!

রিকশাটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, আলোর তরোয়াল মেরে একটা জিপ যেন চলে গেল ঝড়ের মতন, পাঁকের গন্ধ উঠল ট্যাংকের নোঙরা জল থেকে। পৌষের বাতাস এল শনশন করে। আর আবীর আচমকা সেই শব্দটা শুনতে পেল, পেছনে কে যেন ছুটে আসছে। সেই লোকটা, সেই শুয়ারের বাচ্চাটা ছুটে আসছে নাকি! আবীর চোখের পাতা বন্ধ করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করল, কান পেতে থাকল।

চোখের পাতা বন্ধ করে, কান পেতে থাকতে থাকতে, শীতের শনশনে বাতাসে আবীরের হঠাৎ মনে হল, সে আসছে—পরমার সেই মৃত স্বামী, সেই শয়তান। তার পায়ের শব্দ বুঝতে আবীরের আর ভুল হচ্ছে না। কান থেকে সমস্ত বুকে গিয়ে লাগছে শব্দটা। হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কী একটা যে দুলতে শুরু করেছে বুকে, কষ্ট হচ্ছে আবীরের। ছুটন্ত রিকশার চাকা একটানা শব্দ করছে। আবীর শীতে জড়সড় হয়ে বসে। এই আর্দ্র, হিমকুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্নায় রাস্তার দু পাশের জটাজূটধারী বৃক্ষ কিংবা ফাঁকা মাঠ ফেলে ছুটে যেতে-যেতে আবীরের মনে হচ্ছিল তার পক্ষে আর বেশিদূর এ ভাবে যাওয়া সম্ভব নয়, যে মৃত লোকটা ছুটে আসছে সে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে ফেলবে। ধরে ফেলে পরমার পাশে বসে পড়বে। আর এই আবীর তখন কী করবে? কী করবে?

আবীর নিশ্বাস বন্ধ করে, হাত পা শক্ত করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। যেন সে তৈরী। যে মুহূর্তে ছুটন্ত লোকটা লাফিয়ে তার রিকশায় উঠবে সেই মুহূর্তে আবীর রাস্তায় লাফ মারবে।

লোকটার কাছে সে ধরা পড়তে চায় না। তাকে আক্রমণ করার সুযোগ আবীর দেবে না। লোকটা শয়তান, ইভিল; শালার কত জোর কে জানে! নিশ্চয় অনেক, ভীষণ, নয়ত সে পাললা

দিয়ে ছুটতে পারে! কখন থেকে ছুটছে দেখেছো! পাক্কা হারামী। আবীরকে ঠিক চোখে-চোখে রেখেছে, নির্জনে পেলেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাড়া করছে। তোমার এই তাড়া করে বেড়ানো আমি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম, আবীর শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে মনে-মনে বলল: আমি কাওয়ার্ড নই; কিন্তু তুমি শালা ফেস টু ফেস আসছ না, পেছন থেকে আসছ, লুকিয়ে; তোমার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কী করে তোমার সঙ্গে লড়ব। কী করে?

লোকটার পায়ের শব্দ আরও জোর হল নাকি? সে কি রিকশার চেয়েও জোরে ছুটছে? তার কি এত শক্তি!

আচমকা আবীর দেখল লোকটা কখন তার মধ্যে এসে গেছে ...এসে তার পোশাকের মধ্যে চেহারার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পড়ে আবীরের বুকের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে।

না, না, না। আবীর দু' হাতে বুক জড়িয়ে ধরল, যেমন করে জননী তার শিশুসন্তান জড়িয়ে ধরে।

এই অলৌকিক অনুভূতি কখন ভেঙে গেল। রিকশা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আলো জ্বলছে, দোকানপসার, বাড়ি; রাস্তায় লোক চলাচল করছিল।

রিকশাটা শেষ পর্যন্ত পরমার বাড়ির সামনে এসে গেল।

রিকশা থেকে নামার আগে পরমা বলল, "তুমি ওর ছবি দেখতে চেয়েছিলে। চলো আজ দেখাব।"

আবীর রিকশাতেই বসে থাকল। বলল, "থাক, আর দরকার নেই।"

পরমা অপেক্ষা করছিল। বলল, "নামবে না?"

"না।...তুমি ঘরে যাও।"

পরমা সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

রিকশা ঘুরিয়ে ফিরে যেতে-যেতে আবীর ভাবল: সে পরমার

মৃত অথবা জীবিত কোনো স্বামীই হতে চায় না। সে শুধুই আবীর হতে চায়। আর এখন তার পক্ষে বাড়ি ফিরে যেতে-যেতে পরমাকে গুড বাই মিস্টার চিপস করা ছাড়া উপায় নেই।

আবীর দেখে নিল রিকশায় তার পাশে কেউ আছে কিনা—তারপর কাত হয়ে বসে বাঁ হাতটা মুখের ওপর চেপে ধরল।

——